জল-জঙ্গলের

কাব্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোথাও কেউ কোনো মিল দেখতে পেলে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক বলে গণ্য করতে হবে। —লেখক।

এ কী অদ্ভুত হাসি

ব্যাপারটা হলো কী, মনোরঞ্জন তার বৌ-এর কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেললো।

তা পুরুষ মানুষ, বিয়ের পর আট মাস পার হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বৌয়ের কাছে দু' একটা মিথ্যে কথা তো বলবেই। প্রায়দিনই রাত দশটা পর্যন্ত তাশ পেটায় মনোরঞ্জন, হাটবারে কোনো কাজ না থাকলেও সাতজেলিয়া চলে যায়, মানুষের ভিড়ের মধ্যে উঁচু মাথায় ঘোরে, মোহনবাগানের নামে পাঁচ টাকা বাজি ধরে, 'বঙ্গেবর্গী' পালায় ভাস্কর পণ্ডিত হিসেবে যার খুব নাম ডাক, সে রকম মানুষের প্রতিদিন অন্তত গোটা তিনেক মিথ্যে কথা না বললে চলবে কেন? তবে এই বিশেষ মিথ্যেটি বলার সময় তারও বুক কেঁপেছিল।

নদীর ধারে একলা মনোবঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিল বিকেলবেলা। এই সেই বিশেষ ধরনের বিকেল, যে বিকেলে পৃথিবী প্রত্যেক দিনের মতন আটপৌরে নয়। পৃথিবীরানী যেন আজ বেনারসী শাড়ী পরে, যত্ন করে সেজে-গুজে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবেন। নদীর ওপরের আকাশ খুন-খারাবি লাল। নদীর জলে লম্বা লম্বা লকলকে লাল শিখা, কিছুদূরের একটি পাল তোলা নৌকো এখন ক্যালেণ্ডারের ছবি হয়ে গেছে। লালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের বাকি অংশ প্রগাঢ় নীল, এক ঝাঁক বেলেহাঁস চন্দ্রহার হয়ে উড়ে আসে লাল থেকে নীলের দিকে।

মনোরঞ্জন পরে আছে সাদা থানের লুঙ্গি, খালি গা, ডান বাহুতে কালো কার দিয়ে বাঁধা একটা তামার কবচ, তার সরু কোমর থেকে ত্রিভুজ হয়ে উঠেছে বুক, লোহার মরচের মতন গায়ের রং, সরু

চিবুক, ধরালো নাক, চোখ দুটি মুখের তুলনায় ছোট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনোরঞ্জন আকাশে সূর্য-বিদায়ের দৃশ্য দেখছে না, সে চেয়ে আছে পাল-তোলা নৌকাটির দিকে। শীত সদ্য শেষ হয়েছে, বাতাস এখনো মন্থর, বঙ্গোপসাগরের অনেক দূরে মেঘ, এদিকে আসতে দেরি আছে।

এই যে মনোরঞ্জন, এমন সুঠাম চেহারার যুবা, এমন সুন্দর একটি বিকেলে তার মন ভালো নেই।

দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতেই যেন মনোরঞ্জন নৌকোটিকে টেনে আনলো নিজের কাছে। নৌকোটি জেটিঘাটের পাশে এসে ভিড়লো। একজন মাঝি ছাড়া নৌকোয় আর কোনো যাত্রী নেই।

বাঁধের ওপর থেকে নেমে গিয়ে, নৌকোটির কাছে এসে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, কী মাধবদা, কেমন উঠলো আজ?

মাধব মাঝি জেটির থামের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, আমার মাথা।

মনোরঞ্জন নৌকোর ওপর নেমে গিয়ে মাধব মাঝিকে পাল গুটোতে সাহায্য করতে লাগলো। সে কাজ সমাপ্ত হলে সে তার লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে বার করলো একটি ছোট জার্মান সিলভারের কৌটো। তার থেকে আবার বিড়ি এবং কেরোসিন লাইটার বার করে বললো, নাও মাধবদা, বিড়ি খাও।

দু'জনে দুটি বিড়ি ধরালো।

নৌকোর খোলে অনেকখানি জল উঠেছে। সেঁচে ফেলা দরকার। মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, জল ছেঁচে দেবো নাকি?

এবারও মাধব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, ছাঁচ।

মনোরঞ্জন নারকোল মালা নিয়ে জল সেঁচতে লাগলো আর মাধব বিড়ি টানতে টানতে সরু চোখে চেয়ে রইলো সেদিকে। মাধবের জলে-ভেজা রোদে-পোড়া শরীরটা দেখলে বয়েস বোঝা যায় না। ও ক মেদহীন শরীরটা এমনই টন্‌কো যে মনে হয় তার চ[illegible] বুকট. [illegible]

টোকা মারলে টং টং শব্দ হবে। তার মুখে তিন-চার দিনের খুঁখু দাড়ি, মাথায় একটা গামছা জড়ানো। মাধবের চোখ দুটি এমনই উজ্জ্বল যে একনজর দেখলেই বোঝা যায়, সে সাধারণ পাঁচ-পেঁচি ধরনের মানুষ নয়।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাধব জিজ্ঞেস করলো, এত খাতির কিসের জন্যি রে?

—সাধুদা তোমায় একবার ডেইকেছে।

মাধব চিক্ করে জলে থুতু ফেলে বললো, যা, যা, এখন ভাগ্ তো. তোগো ঐ সব মতলবের মধ্যে আমি নাই।

মনোরঞ্জন পাটাতনের ওপর বসে বললো, এক কাপ চা তো খাবে, সারাদিন খেটে-খুটে এলে?

—আমার অত চায়ের শখ নাই।

—অত রাগ করছো কেন? এখন তোমার কী কাজ আছে আর? একটু না হয় বইসলেই আমাদের সঙ্গে। তাশ খেলবে না?

—না!

পাটাতনের নিচে হাত ঢুকিয়ে মাধব একটা খালুই টেনে বার করলো। তাতে রয়েছে সাড়ে তিনশো-চারশো গ্রাম ওজনের একটা ভাঙর, আর দু' তিন মুঠো মৌরলা মাছ। বেচলে বড় জোর পাঁচ-ছ টাকা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে দু' টাকা দিতে হবে মহাদেব মিস্তিরিকে নৌকো ভাড়া হিসেবে, বাকিটা মাধবের আজ সারাদিনের উপার্জন। শীতের শেষের নদীতে মাছ পাওয়াই দুষ্কর।

খালুইটা হাতে নিয়ে মাধব জেটিতে উঠে গেল। মনোরঞ্জন বুঝলো মাধবের মেজাজ এখন নরম করা যাবে না।

সপ্তাহে একদিন হাট, তবে বিষ্টুর চায়ের দোকান রোজই খোলা থাকে। একটা বার্লির কৌটোর তলা কেটে, তারের হাতল লাগানো তার চায়ের ছাঁকনি। কেট্‌লিতে গুঁড়া চা সব সময় ফুটছে। উনুনে [illegible] গুনের আঁচ। একটা আস্ত বানী গাছের গুঁড়ির দু'পাশে

দুটি খুঁটি লাগিয়ে দোকানের সামনে বসানো। সেটাই খদ্দেরদের বেঞ্চি।

বিষ্টুর গোঁফ খুব বিখ্যাত, শিয়ালের ল্যাজের মতন পুরুষ্টু সেইজন্যই হাটুরে লোকেরা তার নাম দিয়েছে মোচা বিষ্টু। তার দোকানের চায়ের ডাক নাম, মোচা বিষ্টুর পেচ্ছাপ। তবু হাটবার কিংবা বিকেল চারটের লঞ্চ এসে যখন ভেড়ে, তখন অনেকই সেই চা খেতে আসে।

বানী কাঠের গুঁড়ির বেঞ্চিতে বসে বিষ্টুর দোকানের দিকে পিছন ফিরে বসে বিকেলের দিকে মনোরঞ্জনদের আড্ডা বসে। সে ছাড়া আর সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ আর সুশীল। আর সাধুচরণ, সে আসে হঠাৎ হঠাৎ। যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়। ঠিক সন্ধ্যের সময় কোথা এক ঝাঁক পোড়া উড়ে আসে, কান-নাকের ফুটোয়, আর কথা বললেই মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আর এক জায়গায় বসে থাকা চলে না।

এই কয়েকজনের মধ্যে বিদ্যুৎ বরাররই রোগা প্যাংলা, সুভাষ একটু মোটার ধাঁচের, বাকি তিন জনের গড়া পেটা চেহারা, অবশ্য মনোরঞ্জনের মতন অমন স্বাস্থ্যবান কেউ না। এই সময় থেকেই ওদের চেহারা ক্ষইতে শুরু করবে। এখন তো ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে কেউ এসে মনোরঞ্জনকে দেখুক, তখন তার কণ্ঠার হাড় জেগে যাবে, গোনা যাবে বুকের পাঁজরা ক'খানা, চক্ষু ঢুকে যাবে কোটরে, শরীরটাকে মনে হবে খাঁচা।

সেই অঘ্রাণের শেষ থেকেই ওদের হাতে কোনো কাজ নেই। কাজ না থাকলে আলস্যে ওদের শরীর ভাঙে। ওদের জন্য আবার কাজ আসবে আকাশ থেকে, যদি বৈশাখে ঠিকঠাক সময়ে বৃষ্টি নামে। ভূমির মতনই, এইসব ভূমিজ মানুষেরও শরীর পুষ্ট হয় বৃষ্টির জলে।

কথাটা প্রথম তুলেছিল নিরাপদ। একবার জঙ্গলে গেলে হয় না?

অন্যরা প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা। দিন কাল পাল্টে গেছে। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে যে-সব গল্প শুনেছে, তা আর আজকাল চলে না। এখন আইন-কানুনের হাত অনেক লম্বা হয়েছে। যখন তখন খপ্ খপ্ করে ধরে।

তবু ঘুষঘুষে জ্বরের মতন, খিদের মতন, রাত চরা পাখির ডাকের মতন কথাটা ফিরে ফিরে আসে। মনে মনে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে। অঘ্রাণ থেকে বৈশাখ, কিছু করার নেই, শুধু তাশ পাশা খেলা আর বিড়ি টানা। যদিবা দু' একদিনের ফুরনের কাজ জোটে কিন্তু এই সময়টা তাল বুঝে কেউ পুরো মজুরি দিতে চায় না। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে দুটো শীতে মনোরঞ্জন রাশিয়ান বীটের চাষ দিয়েছিল, শালগমের মতন রাশিয়ান বীটের চারাগুলো তরতরিয়ে বাড়ে, দামও মন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু গত বছর অসময়ের ঝড়-বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গেছে, মূলধন পর্যন্ত বরবাদ। তাই এ বছরে কেউ ঐ চাষে যায় নি।

হাটখোলার একটা খালি আটচালায় ওদের যাত্রার রিহার্সাল হয়, কিন্তু এ বছর কারুরই যেন রিহার্সালে মন নেই। গত মাসে কলকাতার এক পার্টি এসে জয়মণিপুরে তিনদিন তিনটে পালা করে গেল চুটিয়ে, আশপাশের দশখানা গাঁ থেকে লোক গিয়েছিল ঝেঁটিয়ে। এর পর আর নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের যাত্রা কে দেখবে? গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না। তাছাড়া অশ্বিনীকে সাপে কাটবার পর থেকেই জয়হিন্দ ক্লাবটা একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। অশ্বিনীই ছিল ক্লাবের প্রাণ, প্রম্‌টার, ড্রেসার থেকে পরিচালক পর্যন্ত।

যদি অশ্বিনী ফিরে আসে। অশ্বিনী মারা গেছে, তবু অশ্বিনী ফিরে আসতে পারে। মনোরঞ্জন বিশ্বাস করে না, সুভাষ বিদ্যুৎরা কেউ-ই বিশ্বাস করে না, তবু অশ্বিনীর দাদা হরিপদ যখন বলে যে লখীন্দর ফিরেছিল, অশ্বিনী কেন ফিরতে পারবে না—তখন প্রতিবাদ করে না ওরা। একটু একটু যেন মনে হয়, হঠাৎ একদিন নৌকো

থেকে লাফিয়ে নেমে অশ্বিনী বলে উঠবে, এই তো আমি এসেছি। অমন জলজ্যান্ত মানুষটা। কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অশ্বিনীকে, সঙ্গে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ। এমন কাজের মানুষ ছিল অশ্বিনী, তাকে ফিরিয়ে দিলে ভগবানের সুনাম হতো।

নিরাপদর কথাটা উস্কে দেয় সাধুচরণ। যদি বাপের ব্যাটা হোস, যদি হিম্মৎ থাকে, তবে চল্ জঙ্গলে যাই।

জেল থেকে ফিরে এসে সাধুচরণ খুব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চুরি-ডাকাতি নয়, জয়মণিপুরে জমি-দখলের দাঙ্গায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সাধুচরণ, দেড়টি বছর ঘানি ঘুরিয়ে গ্রামে ফিরেছে। এ গ্রামে সে-ই একমাত্র জেল-ফেরৎ মানুষ। জেল-ফেরৎ তো নয়, যেন বিলেৎ-ফেরৎ। জেলে থাকলে স্বাস্থ্য ভালো হয়, আগে ছিল দোহারা গড়ন, এখন চেহারায় কী চেকনাই!

পরিমল মাস্টার সাধুচরণকে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। এই স্কুলের বৈশাখ মাসে। এমন নিশ্চিন্ত আশ্বাস পেয়েও সাধুচরণ জঙ্গলে যেতে চায় শুনে অন্যরা লজ্জা পায়।

হাটখোলার আটচালায় হোগলা পেতে শুয়ে-বসে আছে ওরা। রিহার্সাল বন্ধ বলে হ্যাজাক জ্বালানো হয় নি, অবশ্য আজ বেশ চাঁদের আলোর ফিন্‌কি দিয়েছে। বিষ্টুর দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। এক সময় নদীর বুকে ঘ্যাসঘেষে আওয়াজ আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ হর্ণের শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পারে পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ তো দিনে মাত্র সেই একবার।

বিদ্যুৎ মাটি থাবড়ে বললো, আমি রাজি।

সাধুচরণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি টানছিল, সে বললো, অন্তত ছ'জন তো লাগবেই।

মনোরঞ্জন বললো, আমিও রাজি।

বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আরে দূর দূর দূর, তুই রাজি হলেই বা তোকে নেবে কে? তুই বাদ।

সাধুচরণ বললো, মনোরঞ্জনকে বাদ দিয়ে এই আমরা পাঁচজন আর যদি মাধবদা যায়—।

বিদ্যুৎ বললো, মাধবদাই তো আসল লোক।

মনোরঞ্জন দুর্বল ভাবে বললো, কেন, আমি বাদ কেন?

কারণটা তো মনোরঞ্জন নিজেই জানে, তাই তার গলার আওয়াজে জোর নেই। তার বিয়ের এখনো বছর পেরোয় নি, তার এখন জঙ্গলে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাধুচরণ বললে, তুই যা তো মনা, তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের এখন অনেক কথা রইয়েছে।

সুভাষ উদারতা দেখিয়ে বললো, আমার টর্চলাইটা নিয়ে যা।

কিন্তু মনোরঞ্জন তক্ষুনি বাড়ি যায় না, আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। গুম হয়ে বসে থেকে ওদের আলোচনা শোনে আর উদাসীন ভাবে বিড়ি টানে।

ওরা আলোচনাই চালিয়ে যায় শুধু, শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। জঙ্গলে যাওয়ার অনেক হ্যাপা। এ তো আর বেড়াতে যাওয়া নয়। সব বন্দোবস্ত করতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কোনো আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা চায় স্বাধীনভাবে যেতে।

বাড়ি ফিরে মনোরঞ্জন প্রথমেই উঠোনে গোলার গায়ে হাত বুলোয়। ইঁদুরে গর্ত করেছে কিনা দেখে নেয়। এঁটেল মাটিতে গোবর মিশিয়ে এমন ভাবে লেপে দেওয়া আছে, যেন সিমেন্ট করা। গোলার গায়ে দুবার থাবড়া মারে মনোরঞ্জন। কত আর হবে, বড় জোর দু'বস্তা ধান। বাড়িতে পাঁচটি প্রাণী দু'বেলা খাবারের জন্য হাঁ করে আছে, এতে ক'টা দিন চলবে?

মনোরঞ্জনের বাপ-মা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেরোসিনের খরচা বাঁচাবার জন্যে ওরা সন্ধে-সন্ধেতেই ভাত খেয়ে নেয়। মনোরঞ্জনের

বাপের নাম বিষ্টুপদ, মায়ের নাম ডলি। চাষীর বাড়ির বউয়ের নাম ডলি? এতে অবিশ্বাসের কী আছে, এদিকে হ্যামিল্টন সাহেবের জমিদারী ছিল না? যখন আচ্ছা-আচ্ছা গ্রামে ইস্কুল বসে নি, তখন থেকেই পাকাবাড়ির ইস্কুল আছে জয়মণিপুরে। দেখবার মতন ইস্কুল। বিষ্টুপদ এবং মনোরঞ্জন দু'জনেই মাঠে হাল ধরে বটে, দু'জনেই কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। মনোরঞ্জনের ছোট্ ঠাকুদ্দা. অর্থাৎ ঠাকুর্দার ছোট ভাইয়ের নাম জেমস সন্তোষ খাঁড়া, তিনি অবশ্য খৃষ্টানই হয়েছিলেন।

সরু লাল-পেড়ে শাড়ী পরা মাঝবয়েসী মনোরঞ্জনের মা যখন পাছ-পুকুরে বাসন মাজতে যায়, তখন তাকে কেউ ডলি বলে ডাকলে তা শুনে নতুন কোনো লোক চমকে উঠতে পারে, কিন্তু এখানকার কেউ চমকাবে না। হ্যামিলটন সাহেব নরেনের পিসীমাকে আদর করে ডাকতেন বেবী। বুড়ি বয়েস পর্যন্ত তাঁর সেই বেবী নামই থেকে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনের দুই দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বড়দা নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে জমি পেয়ে সেখানেই বসতি নিয়েছে, মেজদা গোসাবায় ডাবের ব্যবসা করে। ছ'ভাই বোনের মধ্যে দুটি টুপটাপ মারা গেছে অকালে, ছোট বোনটি ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করে বিয়ের দিন গুনছে মনে মনে।

মনোরঞ্জন বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত তার ছোট বোন কবিতা তার বৌ বাসনার সঙ্গে গল্প করে। এই নাম দুটিও বেশ চকচকে নাইলনের শাড়ী পরা ধরনের নয়? গ্রামের মেয়েদের নাম বুঝি চিরকাল ক্ষেন্তি, পুঁটি কিংবা গোলাপী থেকে যাবে! ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনীর বদলে যাত্রায় আজকাল সামাজিক বিষয়বস্তু থাকে বলে গ্রামের ছেলে মেয়েদের নামও পাল্টে যাচ্ছে। তা ছাড়া সিনেমার নায়ক-নায়িকার নাম। ইলেকট্রিসিটি নেই, তবু এই গ্রামেও মাসে একবার সিনেমা আসে।

কবিতার ডাক নাম বুঁচি। গায়ের রং একটু ফর্সা-ফর্সা, মুখটা একেবারে লেপাপোঁছা।

ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন আর বাজছে রেডিও। রেডিওতে এরকম একটা গান শোনা যাচ্ছে: অশ্রু নদীর...ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো · সুদূর...ঘ্যাটো ঘ্যাটো...ঘাট দেখা যায়...ঘ্যাটো ঘ্যাটো ...ঘ্যাটো খুবই দুর্বল হয়ে গেছে ব্যাটারিগুলো, না পালটালে আর চলে না। রেডিওটা বিয়ের সময় পাওয়া, মাঝখানে দু'বার মাত্র চারখানা করে ব্যাটারি কিনেছে মনোরঞ্জন।

গানটা শুনেই মনোরঞ্জন বুঝতে পারে এখন পৌনে দশটা বাজে। এমন কিছু রাত নয়। তাশ খেলা জমলে এক একদিন বারোটা-একটা বেজে যায়।

বারান্দায় বালতিতে জল রাখা আছে, মনোরঞ্জন হাত-পা ধুয়ে ঘরে এসে বোনকে বললো, আমার ভাত বেড়ে দে, বুঁচি। তোরা খেয়েছিস?

কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনোরঞ্জন তার বৌয়ের থুত্‌নি ধরে বললো, বাসনা আমার বাসনা, একবারটি হাসো না।

বাসনা ফোঁস করে উঠলো, এই কী হচ্ছে!

মনোরঞ্জন তবু বাসনার ডান গাল টিপে ধরে বললো, পুটু পুটু পুটু পুটু পুটু।

বাসনা ক্রুদ্ধ বিড়ালীর মতন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, মনোরঞ্জন ততই খুনসুটি করতে থাকে। তার পর বুঁচি এসে ঘরে ঢুকতেই সে চট করে হাতটা সরিয়ে নেয়। একদিন সে বাসনাকে চুমো খেতে গিয়ে বোনের সামনে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে দিনের শেষ বিড়িটি ধরিয়ে মনোঞ্জন একটু বারান্দায় বসে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ, বাঁ পাশে গোয়াল ঘর, ডান পাশে রান্না ঘর, তার পাশে মাচা বাঁধা, সেখানে উচ্ছে গাছ দুলছে। বাড়িটি বেশ ঝকঝকে তকতকে, চালে নতুন খড় ছাওয়া

হয়েছে এ বছরই। গোয়াল ঘরটি অবশ্য এখন ফাঁকা, গত গ্রীষ্মে গো-মড়কে একটি হেলে বলদ মারা যাওয়ায় ঝটিতি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল অন্যটাকে।

শয়ন ঘর মোট দুটি, কবিতা বাপ-মায়ের ঘরেই শোয়। ওর ভয়ের অসুখ আছে, মাঝে মাঝে ওকে ওলায় ধরে, ঘুমের ঘোরে গোঁ গোঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ। কট্‌রাখালির সাধুবাবার কাছে ওকে নিয়ে যাবো যাবো করেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, তিনি এই সব রোগের একেবারে ধন্বন্তরি। বিয়ের আগে কবিতার এই অসুখ তো সারিয়ে ফেলতেই হবে।

সুখ-টান দেবার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে আসে মনোরঞ্জন। তক্তাপোষের উপর উঠে বসে বললো, ওঃ হো, তোমায় একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি। তোমার বাপের বাড়িতে তো কাল ডাকাত পড়েছিল।

বাসনা ভেতরের ছোট জামা খুলছিল, পেছন ফিরে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, অ্যাঁ?

মনোরঞ্জন বললো, চারটের লঞ্চে লারানদা এলো, তার মুখেই শুনলাম মামুদপুরে কাল বড় ডাকাতি হইয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কার বাড়ি? কার বাড়ি? লারানদা বললে, যে নিতাইচাঁদ হরিণের মাংস বেচতে গিয়ে ধরা পইড়েছিল বসিরহাটে, সেই নিতাই চাঁদের বাড়ি। নিতাইচাঁদ তোমার কাকার নাম না?

বাসনার ছেলেমানুষি মুখখানি আতঙ্কে কালো হয়ে যায়। সে চোখ কপালে তুলে বললো, এ খবর শুনেও তুমি চুপ করে বসে রইলে?

—তা কী করবো, ল্যাজ তুলে দৌড়োবো? লারানদা যখন কথাটা বললে, ততক্ষণে লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছে। তা ডাকাতি যখন হইয়েই গিয়েছে এখন আমার যাওয়া-না-যাওয়া সমান।

—ডাকাতরা আমাদের বাড়ি থেকে কী নেবে?

—তোমার কাকাটা তো এক নম্বরের চোর। চোরাই মাল কত লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে!

—মানুষ মেরেছে?

—দু'জনের তো মাথা ফেটেছে শুনলাম।

—অ্যাঁ? কার? কার মাথা ফেটেছে?

—তা আমি কী করে জানবো! লারানদা তো আর নিজের চক্ষে দেখেনি।

এসব ইয়ার্কির কথা। প্রতি রাত্রেই মনোরঞ্জন এই ধরনের উদ্ভট কোনো গল্প বানিয়ে চমকে দেয় বউকে। বাসনার চোখে জল এসে গেলে সে হো-হো করে হেসে ওঠে। তখন বাসনা এসে তার বুকে গুম গুম করে কিল মারতে থাকে আর বলে, আমার কাকা মোটেই চোর নয়!

তখনও মনোরঞ্জন তার বউকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে আর ক্ষেপায়, চোরই তো, নিশ্চয়ই চোর। তোমরা একেবারে চোরের বংশ, তুমি নিজেও তো একটু চুন্নী।

পাশের ঘর থেকে কবিতা এসব কিছুই শুনতে পায়। এমনকি নিয়মিত ছন্দে এ ঘরের তক্তাপোষের মচমচানির শব্দ পর্যন্ত।

তবে, সেই আসল মিথ্যে কথাটা অবশ্য মনোরঞ্জন সেই রাত্রে বাসনাকে বলে নি। সেটা অন্য রাতের কথা।

সারাদিন মনোরঞ্জন তক্কে থাকে মাধবকে ধরবার জন্য। তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, তবু বন্ধুদের রোমাঞ্চকর অভিযানটা যাতে পণ্ড না হয়ে যায়, সেই জন্য সে মাধবকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মাধবকে আগ বাড়িয়ে বিড়ি দেয়, মাধবের বাড়ির উঠোনের আগাছা সাফ করে দিয়ে আসে, মাধবের ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে লোপালুপি খেলে। তবু মাধব তাকে পাত্তাই দেয় না।

দিন তিনেক এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার পর মাধব শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই ধরা দেয়।

তুপুরবেলা আটচালায় তাশ খেলা জমে উঠেছে, কখন যে মাধব পেছনে এসে বসেছে ওরা টেরও পায় নি। মাধব তাশের পোকা। হঠাৎ মাধব এক সময় বলে উঠলো, আরে ও মনা, কী কল্লি! আরে এ ডা দেখি একটা রামছাগল। হাতে রং রইছে, তুরুপ মারতে পাল্লি না।

মনোরঞ্জন ফিরে তাকাতেই মাধব তার অত্যুজ্জ্বল চোখ তুটি ঝকমকিয়ে বললো, তোরা দাইরাবান্দা খ্যাল, তাশ খেলা তোগো মগজে কুলাবে না!

চার খেলুড়িই ফেলে দিল হার্তের তাশ। সাধুচরণ বললো, মাধবদা, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

মাধব বললো, জানি, জানি, তোমাগো কী কথা। ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার পিঠে এখনো দাগ রইছে।

তু'জনেই এক সঙ্গে বিড়ি বাড়িয়ে বললো, নাও মাধবদা, খাও।

তু'জনের থেকেই বিড়ি নিয়ে, একটি ট্যাকে গুঁজে, আর একটির পেছনে ফুঁ দিতে দিতে মাধব বললো, যতই খাতির করো, ও লাইনে আমি আর যেতে পারবো না। আজকাল ও লাইন খারাপ হইয়া গ্যাছে।

মাধবের মতন কর্মিষ্ঠ পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাকে মাঝি বলা যায়, জেলে বলা যায়, চাষী বা কাঠুরে বা ঘরামীও বলা যায়, সব কাজে সে সেরা। তার কাজের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি তুটোই আছে, সেইজন্য অনেকে তাকে সমীহ করে। যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পতাকা ওড়ায়, যারা অকূল সমুদ্রে নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়েছে এককালে, যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রুর দেশে দাঁড়িয়ে চওড়া কাঁধটা আরও চওড়া করে গর্বের হাসি দেয়। তাদের মুখের সঙ্গে মিল আছে মাধবের।

তবু মাধব সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। একটা ছোট চৌহদ্দির বাইরে সে কোথাও যায় নি কখনো। বেঁচে
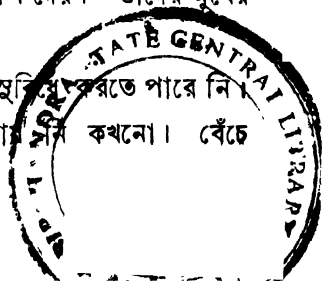
থাকাটাই তার একমাত্র অভিযান। তার জমিও নেই, মূলধনও নেই। শুধু গায়ে খেটে আর কতখানি সমৃদ্ধি হবে। বাড়িতে তার সাতটা পেট। তার নিজের নৌকোটি চলে যাওয়ায় সে আরো বিপাকে পড়েছে।

সাধুচরণ বললো, যদি পারমিট জোগাড় করি মাধবদা?

মাধব সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললো, পারমিট জোগাড় করবি, তুই? হেঃ! তোকে পারমিট দেবে কেডা? হেঃ!

—ধরো না যদি জোগাড় করিই?

—ধর না আমি লাটের ব্যাটা বড়লাট আর আমার মৈয়ে ইন্দিরে গান্ধী! ধরতে আর ঠ্যাকাটা কী, তাতে তো পয়সা লাগে না!

—তুমি বিশ্বেস পাচ্ছো না, মাধবদা, পারমিটের ব্যবস্থা আমি সত্যিই করতে পারি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

—ছ্যাখ, সাধু। আমার সাথে ফোর টুইন্টি করিস নি। আমি তিন তিনবার ধরা পড়িছি, মেরে আমার তক্তা খিঁচে দিয়েছে আমার লৌকোটা পর্যন্ত সুম্মুন্ধির পুতরা বাজেয়াপ্ত কইরা নিছে। আবার আমি তোগো কথায় নাইচ্যা আবার ও লাইনে যামু?

—মাধবদা, সবাই বলে তোমার ভয়-ডর কিছু নেই, এখন দেখছি তুমিই ভয় পাচ্ছো।

—ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি ভয় পাবো না? আমি মলে তুই আমার বউরে বিয়া করবি? পোলাপান গো খাওয়াবি? যমরে ভয় করি না, কিন্তু পুলিশ আর ফরেস্টের লোক আমারে ছিবড়া কইরা দিছে।

সবাই বুঝতে পারে যে মাধব গরম হয়ে এসেছে। মাধব দুঃসাহসী। শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে কোনক্রমে টেনেটুনে সংসার চালানোয় সে বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ কোন ঝুঁকি নিয়ে সে ভাগ্য ফেরাতে চায়। ভাগ্য ফেরেনি বটে, তবে এরকম ঝুঁকি সে বার বার নিয়েছে। অন্তত তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে সে। একবার ডাকাতরা

তাঁর নৌকো থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে তার পরণের কাপড়ও খুলে নিয়ে নাংটো করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল চামটা ব্লকে। সেখান থেকেও প্রাণে বেঁচে সে ফিরতে পেরেছে।

এরকম ঝুঁকি যারা নেয়, তাদের স্বভাব সারা জীবনে বদলায় না।

সাধুচরণ সত্যিই অনেকটা এগিয়ে এনেছে কাজ। জয়মণিপুরের আকবর মণ্ডলের পারমিট আছে, এক ভাগ বখরা দিলে সে সেই পারমিট ব্যবহার করতে দিতে রাজি আছে। এর মধ্যে বে-আইনি কিছুই নেই।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে মাধব বললো, সঙ্গে আর কে যাবে, এই সব চ্যাংড়ারা? এরা তো একটা হাঁক শোনলেই পাছার কাপড় নষ্ট কইরা ফ্যালাবে।

মূল প্রস্তাবকারী নিরাপদ এবার বললে, ও কথা বলো না মাধবদা। জঙ্গলে তুমি একাই যাও নি, আমরাও গেছি।

মাধব বললো, হ্যাঁ, গেছিলি। গত সালে ফুলমালা লঞ্চে টুরিষ্ট বাবুদের রান্নার জোগাড়ে হয়ে গেছিলি না?

মাধবের গলার আওয়াজে রাজ্যের অবজ্ঞা ঝরে পড়ে।

সাধুচরণ বললো, শোনো আমরা কে কে যাবো। তুমি, আমি, নিরা—

মাঝখানে বাধা দিয়ে সুশীল বলে ওঠে, আমি কিন্তু যেতে পারবো না। জয়নগরে আমার মামার মেয়ের বিয়ে আছে—।

মাধব আর সাধুচরণ দু' জনেই জ্বলন্ত চোখে তাকালো সুশীলের দিকে। মাধব পিচ্ করে থুতু ফেললো পাশে।

সাধুচরণ বললো, তোকে নিতামও না আমরা।

মাধব শুধু বললো, হেঃ!

সাধুচরণ আবার বললো, সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ তুমি আর আমি।

মনোরঞ্জন বাদ। যদিও সে সামনে ঠায় বসা। সবার চেয়ে

লশালী চেহারা তার এবং সে ভীতু এমন অপবাদ ঘোর নিন্দুকেও দিতে পারবে না।

সাধুচরণ বললো, আকবর মণ্ডলের পারমিট, তাকে নিয়ে মোট ছয় ভাগ।

মাধব বললো, নৌকোর এক ভাগ লাগবে না? নৌকো তোরে কেডা দেবে?

নিরাপদ বললো, ঠিক, নৌকোর ভাগ ধরা হয়নি। তাহলে সাত ভাগ। মহাদেবদার নৌকো।

মাধব বললো, আট ভাগ হবে, আমার দুই ভাগ। গুণিনের ভাগ নাই?

সাধুচরণ অন্যদের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, রাজি!

এবার জোগাড়-যন্তরের পালা। শুধু পারমিটের দোহাই দিলেই তো হবে না। খোরাকি জোগাড় করতে হবে, যাওয়া-আসা অন্তত এক মাসের ধাক্কা। এই এক মাস বাড়ির লোকজন কী খেয়ে থাকবে তা ভাবতে হবে, নিজেদেরও রান্না করে খেতে হবে। আর আছে বন-বিবির পুজো।

আগে যারা ধার-দেনা ক ব জঙ্গলে যেত, ফিরে এসে দেখতো, লাভের ধন সব পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। এখন আর মহাজনদের অতটা সুদিন নেই, অন্তত এদিককার পিঠোপিঠি কয়েকটা গ্রামে।

মনোরঞ্জন দল-ছাড়া হয়ে গেছে, তবু সে-ই আগ বাড়িয়ে বললো, পারমিট যখন আছে, তখন পরিমল মাস্টারের কাছে চলো না!

পরিমল মাস্টারের নামে সাধুচরণ একটু গা মোচড়া-মুচড়ি করে। কথাটা ঘোরাবার জন্য সে বললো, ক'বস্তা ধান লাগবে আগে হিসেব কর না।

মাধব এসব কথার মধ্যে থাকতে চায় না। ভাড়াটে সৈন্যের মতন সে শুধু নিজেরটা বোঝে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, আমার বাড়ির

জন্য দুই বস্তা ধান আর অন্তত নগদা একশোটি টাকা রাইখ্যা যাইতে হবে। সে ব্যবস্থা তোমরা করো।

ঘুরে ফিরে আবার পরিমল মাস্টারের নাম আসে। সাধুচরণ বললো, মহাদেবদা যদি তিনশোমনি নৌকোটা ছায়, আর বিনা সুদে কিছু টাকা—

মহাদেব মিস্তিরি সম্পর্কে কাকা হয় বিদ্যুতের। সেই বিদ্যুতই বললো, ও দেবে বিনা সুদে টাকা? তুমি পেঁপে গাছে কাঁঠাল ফলতে দেইখেছো বুঝি?

এ সময় নৌকোটা বেশীর ভাগ দিন খালিই পড়ে থাকে। অতবড় নৌকো তো হুট্‌হাট করে কেউ নেবে না। তবু কি মহাদেব মিস্তিরি নৌকোটা ফ্রি দেবে? হিংস্র চোখে তাকিয়ে মহাদেব মিস্তিরি বলবে, বাপধনেরা, ঐ নৌকো যদি ডাকাতেরা নিয়ে যায়, তখন তোদের সবকটাকে বেইচে দিলেও তো ওর দাম উসুল হবে না। তবু যে দিচ্ছি, তা তোদের ভালোবাসি বলেই তো। তাই না? এর পর আবার বিনে পয়সায় চাস্? অকৃতজ্ঞ একেই বলে! আমি এ গ্রামের কোনো মানুষকে ঠকাই না, কারুর ভিটে মাটি চাঁটি করি না, তবু এ গ্রামের মানুষ বিনা সুদে টাকা চেয়ে আমায় জব্দ করতে চায়। হায় অদেষ্ট!

সাধুচরণ পরিমল মাস্টারের প্রিয়পাত্র, তবু সে কেন ওঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তা অন্যরা বুঝতে পারে না।

সাধুচরণ আবার ওদের প্রস্তাবে বাধা দেবার জন্য বললো, মাস্টারমশাই কলকাতায় গেছেন, কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই।

মনোরঞ্জন টপ্ করে জানিয়ে দিল, না, না, মাস্টারমশাই কালই ফিরেছেন। আমি দেইখেছি। জল-পরী লঞ্চে এলেন।

দু'দিন পরে খুব ভালো খবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ আর বিদ্যুৎ দেখা করেছিল পরিমল মাস্টারের সঙ্গে। নিজের কোনো স্বার্থ না থাকলেও মনোরঞ্জনও গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে।

পরিমল মাস্টার দারুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। টাকা-পয়সার আর প্রশ্নই নেই, চাল-ডাল-তেল-নুন যখন যা লাগবে, ওদের পরিবারের লোকেরা তা সময় মতন নিয়ে আসতে পারবে জয়মণিপুরের কো-অপারেটিভের দোকান থেকে। ওরা নিজেরাও প্রয়োজন মতন সেই সব জিনিস নিয়ে যেতে পারবে নৌকোয়। শর্ত হলো, ফিরে এসে মাল বেঁচে আগে শোধ করে দিতে হবে ঐ সব জিনিসের দাম। সুদ লাগবে না এক পয়সাও।

এরপর সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর কোনো বাধাই রইলো না। সামনের বাণেই যাত্রা শুরু।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠলো ওঃ মা, মা, মা মা!

ভয় পেয়ে কী হলো, কী হলো, বলে চেঁচিয়ে উঠলো বাসনা। স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো।

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগলো, মা, মা; রক্ষা করো, মা। আমি আসছি মা।

বাসনা কেঁদে ফেলতেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো কবিতা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বিষ্ণুপদ, তারপর ডলি।

বিষ্ণুপদ বললো, মাথায় থাবড়া দাও তো বৌমা। স্বপন আইটকে গিয়েছে। এক এক সময় অমন আইটকে যায়।

কবিতা ভাবলো, তারই নাকি ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠার রোগ আছে, সেজদার আবার হলো কবে থেকে?

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে বলে যাচ্ছি, মা, মা, আমার অপরাধ নিও না, মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা। তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! আমি আসছি মা।

এক গাদা চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে দেখা যায় মনোরঞ্জনের দু' চোখ জলে ভাসছে।

ডলি ঘরে ঢুকে বললো, ও মনো, কী হইয়েছে, অ্যাঁ? চক্ষু খোল,

এই তো আমি। বালাই ষাট, তুই কেন অপরাধ করবি।

ডলি ভুল করে ভেবেছিল, ছেলে বুঝি কোনো কারণে তার কাছে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মনোরঞ্জন যাকে ডাকছে সে এই মা নয়, আরও অনেক বড় ধরনের মা।

মনোরঞ্জন বিহ্বলভাবে বললো, আমি বন-বিবিকে দেখলাম গো, মা।

—ও, স্বপ্ন দেইখেছিস! একবার উঠে দাঁড়া।

—স্বপ্ন নয় গো, একেবারে চোখের সামনে। গাছতলা আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন মা বন-বিবি, পাশে দুখে, মা আমায় বললেন, বাদার সমস্ত জোয়ান মরদ আমায় একবার পুজো দেয়, তুই বিয়ে করলি আজও আমায় পুজো দিসনি!

বলতে বলতেই বিছানায় দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, যেন প্রবল যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে বুক ফাটা গলায় সে চিৎকার করতে থাকে, আমি আসছি মা, আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার অপরাধ নিও না মা।

আবার সে হঠাৎ উঠে বসে বাসনার হাত চেপে ধরে বলে, মা বন-বিবি আমায় ডেকেছেন!

পরদিন সকালেই রটে গেল যে মনোরঞ্জন মা বন-বিবিকে স্বপ্নে পেয়েছে।

সারা সকাল সে বিছানা থেকে উঠলোই না, এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে কাঁদে, মাঝে মাঝে শূন্যভাবে চেয়ে থাকে।

বিকেলে সাধুচরণ আর তার দলবল দেখতে এলো তাকে। বারান্দায় উবু হয়ে চুপ করে বসে আছে মনোরঞ্জন, বিদ্যুৎ তাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতেও সে খেল না। মায়ের পুজো না-দেওয়া পর্যন্ত সে আর বিড়ি খাবে না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলারও কোনো উৎসাহ নেই তার।

আসল সে-রকম জঙ্গল এখান থেকে এক জোয়ারের পথ। যখন

তখন যাওয়া হয় না। নিরাপদ-বিত্যুৎরা যখন পারমিট নিয়ে কাঠ কাটতে যাচ্ছেই, তখন মনোরঞ্জনও ওদের সঙ্গে ঘুরে আসুক। পুজো দেওয়াও হবে, ছুটো পয়সার সাশ্রয়ও হবে। স্বয়ং বিষ্টুচরণই দিল এই প্রস্তাব।

গোলা থেকে আরও এক বস্তা ধান এর মধ্যে বার করা হয়েছে। গোলাটায় এখন টোকা দিলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে। সেইদিকে তাকিয়ে ডলিও আর কোন আপত্তি করতে পারলো না। তবু সে বার বার বাসনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এক রত্তি কচি বৌটা, তাকে ফেলে চলে যাবে! প্রথম সন্তান জন্মাবার আগে স্বামী-স্ত্রীর বেশী দিন ছাড়াছাড়ি থাকা ভালো নয়। এতে পুরুষ মানুষরা বার-মুখো হয়ে যায়।

সন্ধ্যের সময় সে বাসনাকে জিজ্ঞেস করলো, অ বৌ, মনা তা হলে যাবে ওদের সঙ্গে; বাসনা সম্মতি সূচক ঘাড় হেলায়। ডলি তখন বললো, যাক তবে, ঘুরে আসুক, মা বন বিবি যখন ডেইকেছেন, এখন ঝড়-বৃষ্টি নেই, নদীতে ঢেউও তেমন তেজী নয়…।

বাসনাকে সে বললো, বউ, তোর সিঁতুরের কৌটোটা মনোকে দিয়ে দিস। মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে আসবে।

সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবার পর যাত্রার আগের দিন রাত্রে মনোরঞ্জন বাসনার থুতনি ধরে বললো বাসনা, আমার বাসনা, একবারটি হাসো না!

বাসনা ফোঁস করেও উঠলো না, হাসলোও না। গম্ভীর হয়ে রইলো।

মনোরঞ্জন বললো, মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি, এসময় কেউ অসৈরন করে? জঙ্গলে ভালো কাঠ পেলে আমাদের পার হেড শ পাঁচেক টাকা উপরি রোজগার হবেই। তখন তোমার জন্য একটা শাড়ী… এখানে নয়। একেবারে কলকাতার দোকান থেকে…বুঝলে…

অত বড় নৌকোতে পাঁচজন বসলেও যেন খালি খালি দেখায়। মনোরঞ্জন উঠে বসায় তবু যেন খানিকটা মানানসই হলো। হালে বসেছে মাধব, শাল বাহু নিয়ে মনোরঞ্জন ধরলো একটা দাঁড়।

মনোরঞ্জনকে নিতে মাধব আপত্তি করেনি, কারণ এ ছেলেটাকে দিয়ে কাজ হবে, সে জানে। যেবার কালীর চকের কাছে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল মাধব, সেবার যদি এই মনোরঞ্জনটার মতন আর একটা মানুষও থাকতো তার পাশে, তাহলে লগি পিটিয়ে ডাকাতদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো।

সব সরঞ্জাম তোলা হয়েছে, ওদের বিদায় দিতে এসেছে অনেকে। একমাত্র বিদ্যুৎ শুধু জামা গায় দিয়েছে, আর সবাই খালি গায়ে তৈরি, গণ লেগেছে, এই তো যাত্রার পক্ষে শুভ সময়। নৌকো ছাড়তেই ডলি চেঁচিয়ে বললো, মামুদপুরের পাশ দিয়েই তো যাবি, একবার বৌমার বাপের বাড়িতে দেখা করে যাস।

—আচ্ছা।

—সিঁদুরের কৌটোটা...মনে থাকে যেন।

বাঁধের ওপর অন্যদের জটলা থেকে একটু দূরে একটা নিম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। মনোরঞ্জন সেদিকে তাকিয়ে হাসলো। সেই হাসি দেখে ধক করে উঠলো বাসনার বুকটা। এ কী অদ্ভুত হাসি! মন-খোলা মানুষ মনোরঞ্জনকে অনেক রকম ভাবে হাসতে দেখেছে সে, ভাস্কর পণ্ডিত কিংবা খিঁজির খাঁ রূপী মনোরঞ্জনের অট্টহাসিও সে শুনেছে, কিন্তু এরকম হাসি তো সে কখনো দেখেনি। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে মনোরঞ্জনের, কেমন যেন স্থির দৃষ্টি, ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক করা।

কাল রাতে বেশী কথা হয় নি, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল মানুষটা। আজ সকাল থেকেও নানান কাজে ব্যস্ত। একটুখানির জন্যও বাসনা তার স্বামীকে আড়ালে পায় নি। তাই কি মনোরঞ্জন ঐ রকম হাসি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? কোনো মানুষ একেবারে নতুন ভাবে হাসতে পারে!

একটু পরেই নৌকোটা সামনের ট্যাক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

তিন বন্ধুর উপাখ্যান

জয়মণিপুরে টেলিফোন আছে।

বিদ্যুতের আলো নেই, নদী পেরিয়ে মোটর গাড়ী আসার কথা তো দূরে থাক, ঠিকঠাক গোরুর গাড়িরও রাস্তা নেই। ফুড ফর ওয়ার্কও এই জলা-অঞ্চল চেনে না, তবু এখানে টেলিফোন থাকে কী করে? আছে, আছে। বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের মন ভালো থাকলে টেলিফোন ঝিলিনিং ঝিলিনিং করে বাজে, আবার বিজ্ঞান ভুলে গেলে দু তিন মাস টেলিফোনের ঘুম।

রাত পৌনে এগারোটায় কো-আপ অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো।

এই দোতলা মাঠকোঠাখানির একটি ঘরে বদন দাস শোয়। তার মানে এই নয় যে বদন দাস এই অফিসের দিন রাতের কর্মী। সেরকম কেউ নেই। বদন দাসের বাড়িতে লোক অনেক, জায়গা কম, তাই সে রাত্রে এখানেই থাকে। তারও শোওয়া হলো আর অফিস ঘরটা পাহারাও হলো।

ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরে বদন দাস ওপারের কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। সেও হ্যালো হ্যালো বলে, ওপার থেকেও হ্যালো হ্যালো। তখন সে বললো, আপনি ধরেন স্যার, আপনি ধইরে থাকেন, আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতেছি।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পাঁচ সাত মিনিটের পথ। বদন দাস প্রথমে টর্চ খুঁজে পায় না। এমনই অভ্যেস যে টর্চ ছাড়া রাত্রে বাইরে বেরুতেই পারে না সে। বালিশের পাশে রাখা ছিল, টর্চটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেছে খাটের নিচে।

সারাদিন গরম, কিন্তু রাতের হাওয়ায় এখনো শিরশিরে ভাব। প্রথম বর্ষণের আগে সাপগুলো সাধারণত গর্ত থেকে বেরোয় না। তবু অভ্যেসবশত পায়ে ধপধপ শব্দ করে বদন দাস। আর আপন মনে একটা গান গুনগুনোয়, কথা কয়ো না। শব্দ করো না। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন···

মাস্টারমশাইয়ের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে দেখে বদনের অস্বস্তি চলে যায়। উনি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। পড়াশুনো শেষ করে মানুষ চাকরি করতে যায়। তারপরও কারুর রাত জেগে পড়াশুনো করার মন থাকে? বিচিত্র। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, কথা কয়ো না। গোসাবায় এসেছিল কলকাতার থিয়েটার পার্টি। একবার শুনলেই গানের সুর মনে থাকে বদনের।

—মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।

কো-অপারেটিভের মেয়েদের তাঁতে বোনা কাপড়ের লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে পরিমল মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে?

বদন দাসের মুখে টেলিফোনের বৃত্তান্ত শুনেই পরিমল মাস্টারের বুকের মধ্যে দু-চার লহমার জন্য ঢাকের শব্দ। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা ভয়ের। তারপর প্রত্যাশার।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপাবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে তিনি বললেন, চল।

কোয়ার্টারের সামনের কঞ্চির গেটে হাত দিয়ে তিনি আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু দাঁড়া।

ফিরে গিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতন দ্রুততম ভঙ্গিতে খাটের তলা থেকে টেনে বার করলেন একটা লোহার তোরঙ্গ। তার ডালাটা খুলে ভেতরের অনেক কাগজপত্রের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন অন্ধের মতন। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই।

বাক্সটা বন্ধ করে খাটের তলায় আবার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন, মাঝখানের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুলেখা।

সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় নেই বলে তিনি টেলিফোন এসেছে, বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচদিন আগে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সিগারেট ছেড়ে দেবেন। তখন প্যাকেটে ছটা সিগারেট। প্রথমে ভেবেছিলেন প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন খালের জলে, তারপর ভাবলেন পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট না করে ভূগোলের টিচার বিনোদবাবুকে দিয়ে দিলেই তো হয়। তাও দেননি। বাড়িতে সিগারেট নেই, পকেটে সিগারেট কেনার পয়সা রাখবেন না বলেই সিগারেট খাওয়া হবে না—এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নাই। সিগারেট আছে তবু খাচ্ছেন না, এটাই আসল পরীক্ষা। সেই জন্যেই টিনের তোরঙ্গের মধ্যে।

কিন্তু এইসব সংকটের সময় একটা সিগারেট না থাকলে বড় অসহায় লাগে।

মেয়ে থাকে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের হস্টেলে। ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষ দেবে, তাই আছে মামা বাড়িতে। ওদের কারুর কোনো বিপদ হয়নি তো? প্রথমেই মনে আসে এই কথা।

—কে টেলিফোন করেছে নাম বলেনি?

—বুঝলাম না, মস্টারমশাই। খালি এক নাগাড়ে হ্যালো, হ্যালো, আর বললে এক্ষুনি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনো, ঘুমিয়ে পড়লেও ডেকে তুলবে। সেই জন্যই তো এত রাতে আমি ছুটে এলুম। কটা বাজে এখন মাস্টারমশাই।

—এগারোটা হবে।

এত জরুরি ডাক শুনেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। এক লাখ সত্তর

হাজার টাকার একটা স্কিম দিয়েছিলেন সরকারকে, সেটা পাশ হয়ে গেছে? গত মাসে রাত সাড়ে নটার সময় একজন টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে চীফ সেক্রেটারী তার পরের দিন এদিকে আসবেন। সে রকম কেউ? জেনিভাতে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে, কে যেন বলছিল, জয়মণিপুরে এত ভালো কাজ হচ্ছে পরিমল মাস্টারের যাওয়া উচিত,......টেলিগ্রাম অফিস থেকে অনেক সময় টেলিফোনে খবর জানায়...ছোট শ্যালিকা মিতুন রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে? খোকন বা মিতুর হঠাৎ কোনো অসুখ...

—তুই কি গান গাইছিস রে বদন? ভালো করে কর তো।

—কথা কয়ো না, শব্দ করো না, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন...আর কথাগুলো মনে নেই মাষ্টারমশাই।

—বেশ ভালো গান তো? পুরোটা শিখলি না? তুই আর একটা কী যেন গান গাস, সোনার বরণী মেয়ে-—

—সোনার বরণী মেয়ে, বলো কার পথো চেয়ে, আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া-আ-আ-আ।

কাঠের সিঁড়িতে ধুপ্ ধুপ্ শব্দ করে দুজনে উঠে এলো ওপরে। পরিমল মাস্টার সব রকম উত্তেজনা দমন করে যতদূর সম্ভব শান্ত ভাবে বললেন, হ্যালো।

কোনো উত্তর নেই। লাইনও কাটে নি। ওপাশে ঝন ঝন ঝঁ্যাকো ঝঁ্যাকো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বিলিতি বাজনা।

পরিষ্কার বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো তাঁর কপালে।

তিনি হ্যালো হ্যালো বলে যেতে লাগলেন। নিজের উপস্থিত বুদ্ধি সম্পর্কে ঈষৎ গর্বের ভাব আছে পরিমল মাস্টারের। তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। দেরি দেখে, যে টেলিফোন করছিল সে রিসিভারটা রেখে অন্য কোথাও গেছে। কিন্তু কে এবং কোথা থেকে? সুন্দরবনের এই নিশুতি পাড়াগাঁয়ে যন্ত্রমারফৎ ঐ বাজনার শব্দ যেন মনে হয় অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসছে।

এবার ও'দিক থেকে কেউ রিসিভার তুলো বললো, হ্যালো, কাকে চান ?

এবার রাগ হলো পরিমল মাস্টারের। তিনি কড়া গলায় বললেন, আমি কারুকে চাই না। আমাকে কেউ একজন টেলিফোনে ডেকেছে ? আপনি কোথা থেকে—

—ধরুন !

আরও একটু পরে ওপার থেকে একজন কেউ প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে লাগলো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাল্লো !

—আপনি কাকে চাইছেন ?

—কে, পরিমল ? বাপ্ রে বাপ্ এতক্ষণ লাগে ? আমি অরুণাংশু বলছি...

পরিমল মাষ্টারের বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

কলকাতা শহরতলির একই স্কুলে, একই ক্লাসে, একই বেঞ্চিতে বসে পড়তো তিন বন্ধু। ক্লাস সেভেন থেকে এক সঙ্গে। সুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল। অরুণাংশু অত্যন্ত লাজুক, সুশোভন জেদী আর দলপতি ধরনের, পরিমল টিপিক্যাল ভালো ছাত্র। সে কতকাল আগেকার কথা। ত্রিশ-বত্রিশ বছর তো হবেই। স্বভাবে আলাদা আলাদা হলেও ঐ তিনটি স্কুলের বন্ধু ছিল একেবারে হরিহর আত্মা। স্কুলে সিরাজউদোল্লা নাটকের অভিনয় হলো, সুশোভনই তার নায়ক এবং পরিচালক পরিমল লর্ড ক্লাইভ, কারণ তার রং ফর্সা আর ইংরাজী উচ্চারণ ভালো। অরুণাংশুকে দেওয়া হয়েছিল সামান্য দূতের পাঠ, তাও সে পারে নি। রিহার্সালেই নাকচ।

সময় মানুষকে কত বদলে দেয় ? সেই সুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল এখন কোথায়। ম্যাট্রিকে স্টার এবং স্কলারশীপ পেয়েছিল পরিমল, সুশোভন কোনক্রমে ফার্স্ট ডিভিশান আর অরুণাংশু সেকেণ্ড ডিভিশান। কলেজে এসে তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি। অরুণাংশু মণীন্দ্র কলেজে পড়তে গেল সায়েন্স নিয়ে। সুশোভনও

সায়েন্স, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর যে-সব কলেজে ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে পড়ে, সে-রকম কোনো কলেজে পরিমলের পড়া হলো না, তার বাবার আপত্তি। তাই স্কলারশীপ পেয়েও সে স্কটিশ বা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলো না, সে আর্টস পড়তে গেল সুরেন্দ্রনাথে।

যার যেখানেই কলেজ হোক, প্রত্যেকদিন বিকালবেলা তিন বন্ধুর দেখা হবেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে।

ইন্টারমিডিয়েটের পর সুশোভন গেল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, অরুণাংশু কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে ফেল করে আত্মহত্যা করতে গেল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে এবং কোনোরকমে কম্পার্টমেন্টালে পাশ করে অরুণাংশু কলেজ বদলে সেন্ট পলসে এলো বি এস সি পড়তে। আই এ তে বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই ফার্স্ট হয়ে পরিমল সিটি কলেজে ফ্রি ছাত্র হিসাবে বি এ তে ইকনমিকসে অনার্স নিল।

এই তিন ছাত্রের জীবনের গতি কোন্ দিকে যাবে, তা এই সময়েও ঠিক করে বলা, কোনো জ্যোতিষী কেন, বিধাতারও অসাধ্য ছিল।

যে-বার অরুণাংশু আত্মহত্যা করতে যায়, সেবারই অরুণাংশুর প্রথম কবিতা ছাপা হয় "পরিচয়" পত্রিকায়। পরিমল তখন থেকেই রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। আর প্রেসিডেন্স কলেজে ঢোকার পর থেকে সুশোভন বড়লোকের মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি অভ্যেস করে এবং নিজের সাজপোশাকের প্রতি অত্যধিক নজর দেয়। নিজের ডিজাইনে দর্জির কাছ থেকে বানানো নিত্য নতুন কায়দার শার্ট তার গায়ে।

কোনোক্রমে বি-এস-সি পাশ করে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে অরুণাংশু কাজ নিল এক কারখানায়, যে-কারখানার নামে তখনও ব্রিটিশের গন্ধ। এম এ-তে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র পরিমল তখন ছাত্র নেতা। সুশোভন হবু-ইঞ্জিনিয়ার এবং ডন্ জুয়ান। পরিমলের মধ্যে প্রেমিকের ভাব কখনো দেখা না গেলেও সিক্সথ ইয়ারে উঠেই

সে গোপনে বিয়ে করে সহপাঠিনী সুলেখাকে। তার বিয়ের সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল অরুণাংশু, সে তখন দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে এবং কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি সুশোভন, কয়েক বছর এখানে-ওখানে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে সে চলে যায় নাইজিরিয়ায়। তার মধ্যেই অরুণাংশুর পর পর তিনটি কবিতা "দেশ" পত্রিকায় ছাপা হয়ে রীতিমতন সাড়া জাগিয়েছে। শত শত কবিদের মধ্য থেকে এক লাফে ওপরে উঠে এসেছে অরুণাংশু। বিনীত ও লাজুক অরুণাংশুর সে সময়কার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও অসভ্য শব্দ ব্যবহার। এম এ ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার আগেই সুলেখার সঙ্গে জেলে যায় পরিমল, জেলে বসেই সে অরুণাংশুর কবিতা পড়ে অবাক হয়েছিল। বাংলায় কোনো দিন ভালো নম্বর পায়নি অরুণাংশু, সে এমন কবিতা লিখতে পারে?

সুশোভন আর অরুণাংশুকে এখন বাংলার সকলেই এক ডাকে চেনে। বাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে গেছে তাদের খ্যাতি। অরুণাংশুর জীবনযাপনের নানান সত্যমিথ্যে কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘোরে। কোথায় সেই লাজুক কিশোর, এখন সে দারুণ উগ্র ও অহংকারী, কথায় কথায় লোকের সঙ্গে মারপিট বাধায় এবং মদ্যপানের রেকর্ডে ইতিমধ্যেই সে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছে। যারা তার কবিতার ভক্ত, তারাই তার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

নাইজিরিযায় গিয়ে সুশোভন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটা সৌখিন নাটকের দল গড়েছিল। ভারতে ফিরে এলো সে পুরোপুরি নাট্যকার হিসেবে। বেতারনাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সে গড়লো নিজের দল। এখন সে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা। সুশোভনের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর। সেই উৎকট সাজপোশাকে আগ্রহী,

ডন জুয়ানের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না তার মধ্যে। স্ত্রী ও দুটি সন্তান থাকলেও সুশোভন এখন অনেকটা যেন গৃহী-সন্ন্যাসীর মতন, খদ্দরের পাজামা ও পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরে না, নাট্য প্রযোজনার অবসরে বা অবসর করে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় দেশের মানুষের সমস্যার গভীরে পৌঁছাবার জন্য। তার কথাবার্তার মধ্যেও ফুটে ওঠে ব্যাকুল অনুসন্ধ্যানীর সুর। শান্তিগোপালের যাত্রাদল যেবার রাশিয়ায় যায় নিমন্ত্রণ পেয়ে, সেবারই এক সেবা সংস্থার আমন্ত্রণে সুশোভন তার পুরো নাটকের দল নিয়ে ঘুরে এলো আমেরিকা ও ক্যানাডায়। তার সাম্প্রতিক নাটকটিতে ছিল ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশের প্রতি সমালোচনা ও কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

পরিমলের বাবার খুব আশা ছিল যে ছেলে আই এ এস পরীক্ষা দেবে। পরিমল জেল খেটে আসায় সে সম্ভাবনা ঘুচে গেল, তার ওপরে আবার ছাত্র অবস্থাতেই অসবর্ণ বিয়ে। এ সবের জন্য পরিমলের বাবার ধরলো কথা-না-বলা রোগ। পরের বছরে পরিমল কোনোক্রমে এম-এটা পাশ করে। পরিমল আর সুলেখা বাসা ভাড়া করলো বরানগরে, বেহালায় একটি কলেজে পরিমল যোগ দিল লেকচারার হিসেবে, আর দক্ষিণেশ্বরের একটা স্কুলে সুলেখা। তবে রাজনীতির সঙ্গে সুলেখা জড়িয়ে রইলো বেশী করে। দ্বিতীয়বার গর্ভবতী অবস্থায় একাই জেলে গিয়ে সুলেখা ছাড়া পায় ঠিক তার প্রথম সন্তানের জন্মের দেড় মাস আগে।

একই স্কুলের এক ক্লাসের এক বেঞ্চের তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন খ্যাতিমান নাট্যকার ও পরিচালক অন্যজন বিশিষ্ট কবি। অথচ বাংলায় সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছিল পরিমল। সে লেখার দিকে না গিয়ে অন্তত কোনো মন্ত্রী বা লোকসভা কিংবা বিধানসভায় বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতা হলেও মানানসই হতো। কিন্তু পরিমল সেদিকে গেল না।

সক্রিয় রাজনীতি করার বদলে পরিমল আস্তে আস্তে হয়ে উঠলো তাত্ত্বিক। সে পড়ুয়া মানুষ, মিছিলে গিয়ে চিৎকার কিংবা মাঠে গিয়ে আগুন-ঝরা বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সে ঘরোয়া বৈঠকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেই ভালো পারে ও ভালোবাসে। তাত্ত্বিকরা থাকে পেছনের দিকে, ক্যাডাররা সকলে তাদের চেনে না। তবু এই অবস্থাতেই পরিমল সন্তুষ্ট ছিল। সুলেখা তো অন্তত প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আছে।

ভেতরে ভেতরে কবে যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তা পরিমল নিজেও ঠিক টের পায়নি প্রথমে।

সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর দুটি ব্যাপার গুপ্ত কাঁটার মতন পরিমলকে সর্বক্ষণ একটু একটু পীড়া দিত। বরানগর থেকে সেই বেহালায় কলেজে পড়াতে যাওয়া—এই যাতায়াতে শুধু সময় নয়, জীবনীশক্তিরও অনেকটা খরচ হয়ে যায়। প্রতিদিনের বিরক্তি। অথচ বাড়ি পাল্টানো যায় না নানান কারণে। বরানগরের বাড়ি থেকে সুলেখার স্কুল কাছে। সুলেখার বেশী সময় দরকার। অনেক চেষ্টা করেও এদিকে কাছাকাছি কোনো কলেজে চাকরি পায়নি পরিমল। হোমরা চোমড়া কারুকে ধরাধরি করে নিজের জন্য চাকরি জোটাবে, সেরকম মানুষই পরিমল নয়। তা ছাড়া এম-এ-তে তার রেজাল্টও ভালো হয়নি, সাধারণ সেকেণ্ড ক্লাস। সুলেখা তো আর এম-এ পরীক্ষা দিলই না।

বাড়িটা বদলানো দরকার ছিল নানা কারণে। কিন্তু এ দেশে চাকুরিজীবীদের সন্তান জন্মালে আয় বৃদ্ধি হয় না, যদিও খরচ বেড়ে যায়। মিতু আর খোকন তখন জন্মে গেছে। বাড়ি পাল্টানো মানেই বেশী ভাড়া। প্রফুল্ল সেনের আমলের ডামাডোলের সময় কলকাতার বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গেল, তারপর লাফাতে লাগলো তিনগুণ চারগুণের দিকে।

দু'খানা ঘর, একটা বারান্দা, আলাদা বাথরুম-রান্নাঘর, দোতলায়

মোটামুটি খোলামেলা, ভাড়া একশো পঁচাত্তর, ছাড়লেই অন্তত চারশো! ও বাড়ির বাড়িওয়ালা অবশ্য পরিমলদের উঠিয়ে দেবার জন্য কোনো চক্রান্ত করেনি, লোকটা জানতো যে ঐ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রাজনীতি করে, ওদের পেছনে জোর আছে। তবু ঐ বাড়িওয়ালার জন্যই পরিমলের মনে হতো, আঃ, যদি এ নরক ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া যায়! লোকটির অন্য কোনো দোষ নেই, দেখা হলে হেসে কথা বলে। তবু ঐ ব্যক্তিটি অসম্ভব রকম অমার্জিত। যখন তখন পরিমলের সামনেই লোকটা ফ্যাঁৎ করে সিক্‌নি ঝাড়ে, ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে গয়ের ফেলে, একতলার উঠোনে খোলা নর্দমার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকের ধুতি উরু পর্যন্ত তুলে পেচ্ছাপ করে।

সুলেখা এসব গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পরিমল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না এমন অমার্জিত কোনো মানুষকে। লোকটা তার নিজের বাড়ি নোংরা করছে, তাতে তার বলারই বা কী আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকটি কদর্য অশ্লীল ভাষায় অন্যদের সঙ্গে কথা বলে। সব নাকি রসিকতা। কিছু বলতে পারতো না বলেই পরিমলের বেশী কষ্ট। তার সব সময় ভয়, যদি তার ছেলেমেয়েরা এসব দেখে শেখে।

সুলেখার সময় কম বলে পরিমলই বেশী নজর রেখেছিল মিতু আর খোকনের ওপর। সময় পেলেই সে ওদের নিয়ে পড়াতে বসেছে। সে জানতো, মাস্টার-দম্পতির পুত্র কন্যা, ওরা যদি ভালো রেজাল্ট না করে, স্টাইপেণ্ড স্কলারশীপ না পায়, তা হলে ওদের বেশী দূর পড়ানো সম্ভব হবে না। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে শুধু মূর্খই করে, এই শ্লোগান তখন উঠতে শুরু করেছে, তত্ত্বের দিক থেকে এ কথা পরিমল মানেও বটে, কিন্তু তার ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে পড়া বন্ধ করে দেবার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার এক একটি যন্ত্র হয়েই তো সে আর সুলেখা জীবিকা সংগ্রহ করছে।

শুধু বেহালার দূরত্ব বা বাড়ি না পাল্টাবার জন্যই নয়, ভেতরে ভেতরে অন্য ভাবেও ক্ষইছিল পরিমল। দলের বৈঠকে নিরস তাত্ত্বিক আলোচনাতেও এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে। এর চেয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো অনেক ভালো। মাটিতে পা দিয়ে হাঁটা নদীর ধারে বা গাছতলায় বসা মানুষকে তার নিজের পরিবেশ পাওয়া।

বিবাহিত জীবনের এগারো বছর পূর্ণ হবার পর পরিমল একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলো, সুন্দরবনের জয়মণিপুরে একটা কো-এক হাইস্কুলে তু'জন টিচারের চাকরি খালি আছে, তুমি যাবে?

পাঁচ মিনিট কথা বলেই সুলেখা অনেকটা বুঝে ফেললো। স্বামীর মনের এই নিঃস্বতার দিকটিব সন্ধান সে বিশেষ নেয় নি। সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তুমি পারবে?

ইন্টারভিউ দিতে গেল তু'জনেই। সেই প্রথম ক্যানিং থেকে লঞ্চে চেপে ওদের সুন্দরবন দেখা। অনেকটা যেন বেড়াতে যাবার ভাব। স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ এরকম বিশেষ হয় নি। গোসাবার ভাতের হোটেলে গরম গরম ভাত আর পাতলা মাছের ঝোল খেতেও খুব ম. . লেগেছিল।

অসুবিধা হলো পরিমলকে নিয়ে। স্কুলের এম, এ, পাশ শিক্ষকরা কলেজে সুযোগ নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর পরিমল কলেজ ছেড়ে স্কুলে আসতে চায় কেন? ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক নয়? স্কুলে রাজনীতি ঢোকার ব্যাপারে সবাই তখন চিন্তিত। অর্থাৎ সবাই সতর্ক, অন্য পার্টির লোক যাতে না ঢুকে পড়ে।

পরিমল জবাব দিয়েছিল, খুব ছেলেবেলায় আমি গ্রামে কাটিয়েছি, তারপর টানা পঁচিশ-তিরিশ বছর শহরে। এখন আমার আবার গ্রামে এসে থাকতে ইচ্ছে করে।

হেডমাস্টারমশাই সদাশিব ধরনের। অর্থাৎ ভালো মানুষ কিন্তু

অকর্মণ্য। তিনি পরিমলের মুখের ভাব দেখে আন্দাজ করলেন, এই লোকটির কাঁধে অনেক ভার চাপানো যাবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যখন আসতে চায় তখন সহজে চলে যাবে না বলেই মনে হয়।

—এদিকে আসতে চাইছেন, বাদা অঞ্চলের মানুষজন চেনেন? থাকতে পারবেন এদের সঙ্গে? দখনে মানুষদের সম্পর্কে লোকে কী বলে জানেন না?

—যেখানেই যাই, মানুষের সঙ্গেই তো থাকতে হবে।

—গ্রাম ভালোবাসেন, নেচার-লাভার, কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি মশাই?

ক্লান্তভাবে পরিমল বলেছিল, নাঃ, আমি জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি।

তারপর এখানে কেটে গেছে দশ বৎসর। এখন ক্যানিং থেকে মোল্লাখালি, এর মধ্যে পরিমল মাস্টারেব নাম জানে না এমন কেউ নেই। মানুষেব সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার এতখানি শক্তি বা উৎসাহ যে তার মধ্যে নিহিত ছিল, পরিমল তা নিজেই জানতেন না। এখানেও লোকে ফড়াৎ করে সিকনি ঝাড়ে, শব্দ করে গয়ের তোলে, পেচ্ছাব করে যেখানে সেখানে, তবু পরিমলের খাবাপ লাগে না। অল্প চেনা লোককে তুই বলতে একটুও আটকায় না তাঁর। এখানে পোশাকের বাহুল্য নেই। মুখের ভাষাটাও বদলে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম লোকের মুখে 'নির্দোষী' শুনলে বলতেন 'নির্দোষ' বলো, অলসকে কেউ আয়েসী বললে তাঁর কানে লাগতো 'আয়েসী' মানে তো পরিশ্রমী। এখন ওসব চুকে গেছে। এই যে বদন, ও কিছুতেই সমবায় বলবে না, সব সময় বলে সামবায়। পরিমল ওর পিঠ চাপড়ে বলেন, ঠিক আছে, ওতেই চলবে।...

—কী ব্যাপার অরুণাংশু? এত রাত্রে?

—তোর ওখানে সুশোভন গিয়েছিল গত সপ্তায়? আমায় বলিসনি কেন?

—সুশোভন তো নিজে থেকেই হঠাৎ এসেছিল।

—শালা, আমায় বাদ দিতে চাস?

—কোথা থেকে কথা বলছিস?

—পার্ক স্টিট থেকে। সুশোভনের সঙ্গে তোর বেশী খাতির? ওসব নাটক ফাটক আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্গের গ্যারিক! একদিন একটা থাপ্পড় কষাবো।

—তুই কী বলছিস, অরুণাংশু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এখানে আসবার পর প্রথম পাঁচ ছ'বছর পরিমল কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন নি। কলকাতায় গেলেও বন্ধুদের সঙ্গে পারতপক্ষে দেখা করতেন না। সকলের ধারণা হয়েছিল, সপরিবারে পরিমল অজ্ঞাতবাসে গেছে। রাজনৈতিক সহকর্মীরা দু'একজন এখানে আসতে চাইলেও পরিমল বিশেষ উৎসাহ দেখান নি, এড়িয়ে গেছেন। সুশোভনকেও ডাকেন নি। কুমীরমারীর হাটে সুশোভনের সঙ্গে এক দারুণ বৃষ্টিবাদলার সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা। সুশোভন নিজেই একা ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়েছিল। দু'জনই দুজনকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল, আরেঃ। যেন জঙ্গলের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির সাক্ষাৎকার।

তারপর থেকে সুশোভন মাঝে মাঝেই আসে। দু তিন দিনের জন্য গ্রামের মধ্যে হারিয়ে যায়, ফিরে এসে পরিমলের কোয়ার্টারে পুরো একদিন ঘুমোয়। অরুণাংশুও একবার এসেছিল গত বৎসর, সেই সূত্র ধরে কয়েকজন সাংবাদিক। সুন্দরবনে বেড়াবার নামে দল বেঁধে শহুরে লোকের এখানে আসা পরিমল মাস্টারের একেবারেই পছন্দ নয়। ক্রমশ তার মনে এই বিশ্বাসটা দানা বাঁধছে যে, শহরের ছোঁয়াচটাই এইসব জায়গার পক্ষে খারাপ।

পার্ক স্ট্রিটের আলোর রাজ্যে বসে থেকে অরুণাংশু বোধ হয় কল্পনাই করতে পারছে না যে এখানে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ওখানে বাজছে বিলিতি বাজনা, এখানে ঘ্যা-ঘো ঘ্যা-ঘো শব্দ ডাকছে

কোলা ব্যাঙ। মদের টেবিলে অরুণাংশুর বন্ধুরা এক সন্ধেবেলা যা খরচ করবে তাতে এখানকার এক ই পরিবারের একমাস সংসার চলে যায়। একটি পরিবার, না দুটি পরিবার?

অরুণাংশু আরও কিছুক্ষণ টেলিফোনে রাগারাগি করলো। তারপর ঘোষণা করলো, আগামী রবিবার সে এখানে আসছে, মুর্গী ফুর্গি কিচ্ছু চাই না, শুধু মাছ, টাটকা মাছ খাওয়ালেই হবে।

আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। বিখ্যাত লোকদের অনেক রকম যোগাযোগ থাকে, হয়তো অরুণাংশু ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কোনো লঞ্চ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। অরুণাংশু তা পারে।

—অরুণাংশু, তুই আসবি, খুব ভালো কথা, শুধু একটা অনুরোধ করবো? সঙ্গে বেশী লোকজন আনিস না।

—যদি বউ বাচ্চা নিয়ে আসি?

—তা হলে তো আরও ভালো। সুলেখা বলছিল ..

—হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ! গুন্নাইট মাই বয়।

লাইন কেটে দিয়েছে অরুণাংশু। শেষ কালে অমন হেসে উঠলো কেন? এর মধ্যে হাসির কী খুঁজে পেল? পরিমল ভাবলো, আমরা সবাই মধ্যবয়স্ক হয়ে গেছি, অরুণাংশুর মধ্যে খানিকটা ছেলে-মানুষী রয়ে গেছে এখনো। কবিতা লিখতে গেলে বা কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বুকের মধ্যে বোধহয় শৈশব জাগিয়ে রাখতে হয়।

গত বছর এসে অরুণাংশু যেমন জ্বালিয়েছিল খুব, সেরকম একটা ব্যাপারে অবাকও করেছিল।

অরুণাংশুর বায়নাক্কার শেষ নেই। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পাঁচজনকে। দিনের মধ্যে দশ-বারোবার চায়ের হুকুম, তা ছাড়াও সর্বক্ষণ এটা চাই, ওটা চাই। গ্রামের একটি মাত্র দোকানে যা সিগারেট ছিল, তা মাত্র দু' দিনে অরুণাংশু বলতে গেলে একাই সব শেষ করে ফেললো, তারপর নৌকোয় করে একজন লোককে পাশের গ্রামের হাটে পাঠাতে হলো সিগারেট আনবার জন্য। অরুণাংশু

এখানে যাতে মদ্য পান না করে সেজন্য কাকুতি-মিনতি করেছিলেন পরিমল মাস্টার, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি, তার ওপর দুটো কাচের গেলাস ভেঙেছে এবং খালি বোতলটা রাত্রির অন্ধকারে ফাঁকা মাঠ ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েদের হোস্টেলের কম্পাউণ্ডে। এরকম মূর্তিমান উপদ্রব পরিমল মাস্টার এখানে চান না।

ফিরে গিয়ে সুন্দরবনের গ্রামের পটভূমিকায় অরুণাংশু একটা ছোট গল্প লিখেছিল। সে গল্পটা পড়ে পরিমল মাস্টার বিস্মিত না হয়ে পারে নি। একেবারে এখানকার গ্রামের নিখুঁত ছবি। সমস্যার খুব গভীরে সে ঢুকতে পারে নি হয়তো, সে চেষ্টাও করেনি কিন্তু চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। অরুণাংশু গ্রামে ঘুরলো না, লোকজনের সঙ্গে ভালো করে মিশলো না, শুধু আড্ডা দিয়ে আর মদ খেয়ে চলে গেল, তবু সে এতসব জেনে গেল কী করে? তবে কি ওদের একঝলক দেখে নিলেই চলে? এরই নাম কি অন্তর্দৃষ্টি?

অরুণাংশুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে পরিমল মাস্টার প্যাকেটের সবকটা সিগারেটই শেষ করে ফেলেছেন। এবার তিনি বদনকে বললেন, একটা বিড়ি দে, বদন!

বদন বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো মাস্টারমশাই?

—না রে পাগল! আমি ঠিক গান গাইতে গাইতে চলে যাবো।

পরিমল মাস্টারের স্টকে একটিই মাত্র গান। আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। এক এক সময় এই গানকেই তিনি প্রেম-সঙ্গীতের মতন খুব ভাব দিয়ে গান, তখন তাঁর চোখ দুটি আধো-বোজা হয়ে যায়।

সুলেখা জেগে আছেন। থাকবেনই, কৌতুহল চেপে মানুষ ঘুমোতে পারে না। সব শুনে তিনি বললেন, এর থেকে খারাপ খবরও তো হতে পারতো।

একবার সিগারেট খেতে শুরু করায় পরিমল মাস্টারের মুখ শুল

শূন্য করছে আর একটা সিগারেটের জন্য। অথচ উপায় নেই, এখন যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যায়। পরিমল মাস্টার মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে পড়লেন আর সুলেখা গেলেন শিয়রের কাছে জানলাটা বন্ধ করতে।

তখনই তিনি শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজটা।

বাইরের অন্ধকারে নিঃসাড়ে পড়ে আছে পৃথিবী। আলো নেই, তাই কোনো ছায়া নেই, সেইজন্য কোনো কিছুর অস্তিত্বও নেই। এর মধ্যে কান্নার আওয়াজ কেমন যেন অপ্রাকৃত মনে হয়।

একজন নয়, অনেকের কান্না। সুলেখা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে মুখ ফেরালেন।

—কী ?

—কারা যেন কাঁদছে। এখন তো সাপ-খোপের দিন নয়।

মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে একটু দ্বিধা করলেন পরিমল মাস্টার। তবু বেরুতেই হলো। তিনি বুঝতে পারলেন আওয়াজটা আসছে নদীর ওপার থেকে। বাতাসের তরঙ্গে একবার জোর হচ্ছে, একবার ক্ষীণ। গানের সুর বলেও মনে হতে পারে।

অতি দ্রুত তিন-চার রকম কারণ ভাববার চেষ্টা করলেন পরিমল মাস্টার। তবু পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারলেন না। মাথাটা ঠিক মতন কাজ করছে না। খুব যেন ক্লান্তি এসে ভর করেছে চোখের মাথায়। জানালার কাছ থেকে সরে এসে কাতর ভাবে বললেন, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, এত রাতে করবার কিছু নেই। জানলাটা বন্ধ করে দাও, আমি একটু ঘুমোই।

মাধব মাঝির বিবরণ

—তুমি তো সঙ্গে ছিলে মাধব মাঝি, তবু কেন এরকম হলো ?

মাধব মাঝি এমন উত্তেজিত যে তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ দুটি অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতন, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে।

—আমি···আমি···শাল্‌লা, বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখি নাই, কখনো শুনিও নাই। কেউ...আমরা কেউ দ্যাখলাম না, একটা পাতা পড়ার শ-শ শব্দ শুনলাম না, আর একটা মানুষ মইধ্যখান থিকা···

মধু ভাঙতে, কাঠ কাটতে যে দলটি গিয়েছিল জঙ্গলে, তারা অসময়ে ফিরে এসেছে। মাধব ছাড়া আর বাকি ক'জন মাটিলেপা দেয়ালের মতন মুখ করে বসে আছে ঠায়। কাঁদছে ডলি, কবিতা, বাসনা আর প্রতিবেশীদের কয়েকটি স্ত্রীলোক। মনোরঞ্জন ফেরে নি।

এত রাতেও নাজনেখালির মাতব্বর ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়িতে। এরকম সংবাদ শুনলে সবাই আসে। একেবারে শেষে এলো নৌকোর মালিক মহাদেব মিস্তিরি। প্রত্যেকবার নতুন করে বিবৃত হচ্ছে পুরো কাহিনী। পুরুষরা কেউ কাঁদে না, কারণ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সুন্দরবনের আসল জঙ্গলে গেলে এক আধজনকে বাঘের মুখে পড়তে হবে, এতে অবাক হবার কী আছে ? যারা চোরাই কাঠ আনে তাদের সঙ্গে কারবার আছে মহাদেব মিস্তিরির। এই তো গত মাসেই সেরকম একটা দলের রফিকুল মোল্লা খতম হয়ে গেল। নাড়িভুঁড়ি বার করা অবস্থায় রফিকুল মোল্লার লাশ নামানো হয়েছিল ন্যাজাট জেটিতে। গোসাবার কাছে

একটা গ্রামের নামই বিধবা গ্রাম হয়ে গেছে না? কাঠ কাটা কেন, যত জেলে মাছ ধরতে যায়, তারা সবাই কি ফেরে?

কিন্তু এরা তো গিয়েছিল পারমিট নিয়ে, আইনসম্মত ভাবে। বাঘ বুঝি আইন মানে, পারমিট থাকলে কাছে ঘেঁষে না? সে কথা হচ্ছে না। সুন্দরবনের কাঠ কেটে সুন্দরবনের অর্ধেক মানুষের পেট চলে। অথচ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেললে বাঘ বাঁচবে কি করে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা বাঘ দেখবে না? সেইজন্য তৈরি হয়েছে টাইগার প্রজেক্ট। সরকার বিভিন্ন জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ অংশ 'কোর এরিয়া' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সেখানে শুধু বাঘ থাকবে, মানুষের প্রবেশ নিষেধ। বাকি জঙ্গলে পারমিট নিয়ে যার খুশী কাঠ বা মধু আনতে যাক না। চুরি করে কাঠ কাটতে গেলে তো ধরা পড়লে নৌকো বাজেয়াপ্ত হবেই, জেলও খাটতে হবে। যে-কোনো চুরিরই শাস্তি আছে। কার জিনিস কে চুরি করছে, সে আলাদা কথা।

একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতন চেহারা মহাদেব মিস্তিরির। পয়সার জোর, বন্দুকের জোর আর গায়ের জোর আছে বলেই না লোকে তাকে মানে। তবে নিজের গ্রামের লোকের রক্ত শুষে সে টাকা বানিয়েছে, এমন অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তার চালের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা সবই বাইরের লোকের সঙ্গে।

মহাদেব মিস্তিরিকে দেখে কবিতা কাঁদতে কাঁদতেই একখানা চাটাই এনে উঠোনে পেতে দিল। মহাদেব মিস্তিরি মাধব মাঝির সামনে গ্যাঁট হয়ে বসলো, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গাঁজার কল্কে টানার মতন হাত মুঠো করে সিগারেট টানলে তার তিন আঙুলের চারটি আংটি দেখা যায়।

—ছেলে ছোকরাদের না হয় মাথা গরম, কিন্তু মাধব, তুমি তো পোড় খাওয়া মানুষ। তুমি কী বলে এমন আহাম্মুকী করলে?

—আপনে, আপনে বিশ্বাস করেন, মহাদেবদা, ঠাকুর ফরেস্টে আমি আগে কতবার গেছি, কোনোদিন কিচ্ছু হয় নাই।

—ঠাকুর ফরেস্টে বাঘ? তুমি বলো কি, মাধব? সেখানে তো একটা শেয়ালও নেই।

—দয়াপুরে বাঘ আছে? ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসে ক্যামনে, আপনে আমারে ক'ন তো? আসে নাই সেখানে বাঘ?

মিস্তিরি সম্প্রদায়ের সকলেই বৈষ্ণব। মহাদেবের গলায় কণ্ঠি আছে। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মহাদেব বললো, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! ভাবলেই এখনো মহাদেবের সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে। ছোট মোল্লাখালিতে যেদিন বাঘ আসে, সেদিন সেখানে মহাদেব উপস্থিত। হাটের কাজকর্ম সেরে সে রাত্তিরে রাত্তিরেই নৌকোয় উঠেছিল। ওরে বাপ্ রে বাপ্, তার নৌকার পাশ দিয়েই বাঘটা সাঁতরে গিয়েছিল ছোট মোল্লাখালির দিকে!

আসল কাহিনী ভুলে গিয়ে সকলে কিছুক্ষণের জন্য ছোট মোল্লাখালির সেই বাঘ আসার দিনটির গল্পে মগ্ন হয়। দয়াপুর গ্রামের বাঘটাকে তো ধরে নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িখানায়। কী যেন একটা শখের নাম রাখা হয়েছে সেই বাঘটার, দয়ারাম না সুন্দরলাল?

কাঁদতে কাঁদতে একটু থেমে গিয়ে ডলি হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে বাসনাকে বললো, রাক্কুসী, তুই-ই তো আমার ছেলেটাকে খেলি। হারামজাদী, বিয়ের পর এখানো বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে কেউ স্বোয়ামীকে জঙ্গলে পাঠায়? কতবার বলিছি, রাত্তিরে চুল খোলা রাখবি না, তা ঢঙী বউ সে কথাই শোনে না। স্বামীর অকল্যাণের কথা যে না ভাবে···ছোটলোকের ঘরের মেয়ে···বিয়ের সময় একখানা শাড়ি দিয়েছে, শাড়ি তো নয় গামছা—

বলতে বলতেই উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলি বাসনার চুল ধরে টেনে ফেলে দিল মাটিতে। আজ বিকেল পর্যন্ত ছেলের বউ ছিল তার আদরের পুতুল। মাতৃস্নেহ হঠাৎ তাকে উন্মাদিনী করেছে।

অন্য স্ত্রীলোকেরা ডলিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিল।

ডলিও তখন চিৎকার করছে, বনবিবির পুজো দেবে? কেন জয়মণিপুরে বনবিবির থান নেই? খালিসপুরে নেই? উজিয়ে সেই বাঘের মুখে যেতে হবে। শতেকখোয়ারী মাগী, ছোটলোকের ঘরের মেয়ে···কোনোরকম হায়া জ্ঞান নেই···।

ডলিকে ছ'জনে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্যদিকে।

পুরুষের দল কথা থামিয়ে এদিকে চুপ করে চেয়ে ছিল। মেয়ে-ছেলেদের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না।

—তারপব গোড়া থেকে সব খুলে বলো তো?

—আমি বলছি।

—তুই থাম, সাধুচরণ, মাধবের মুখ থেকে শুনবো।

হাঁটু দুটো দু হাত দিয়ে ঘিরে বসে আছে মাধব। ডান হাতটা মুঠো করে পাকানো, আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরা একটা বিড়ি। টানার কথা খেয়াল নেই। বিনা দোষে প্রচণ্ড শাস্তি পাওয়া মানুষের মতন তার মুখ। সেই প্রায়ই ভাবছে নিজের কথা। মনোরঞ্জন মারা গেছে, কিন্তু সে নিজেও কি মরে নি? কাঠ বা মধু কিছুই আনা হলো না, ফিরতে হলো খালি হাতে, অথচ পরিমল মাস্টারের কো-অপ দোকানে ধাব রয়ে গেল। এই ধার সে কী করে এখন শুধবে? মনোরঞ্জনের জন্য আপশোস করলে এখন তার নিজের পেটের জ্বালা মিটবে?

—তাহলে শোনেন, প্রথম রাইতটা তো আমরা কাটাইলাম দত্ত ফরেস্টে, ফরেস্ট-অফিসের ধারেই। বড়বাবু ঘুমায়ে পড়েছিলেন, তেনারে তো জাগানো যায় না, পবেব দিন সকালে পারমিট দেখাতে হবে। সে রাইতে রান্না করলো সাধুচরণ আর বিদ্যুৎ, মনোরঞ্জন আমাগো দুই তিন খান গান শোনাইল ··। আহা কী যেন একখান, ভারী সুন্দর গান গেয়েছিল···আমরা কইলাম, মনোরঞ্জন, আর একবার গা, আর একবার···।

পরদিন সকালে ভাটা, তাই বসে থাকতে হলো দুপুর পর্যন্ত।

তারপর ওরা যেতে লাগলো মারিচঝাঁপির পাশ দিয়ে। হাল একজন, বৈঠা একজন, আর চারজন তাশ পেটায়। সন্ধের কাছাকাছি একটা খাঁড়ির মুখে নৌকা বেঁধে বার কতক খেপলা জাল ফেলে দেখা হলো মাছের আশায়। জোয়ারের সময় মাছ পাওয়ার আশা খুব কম, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম হতে হতেও শেষবারে সাধুচরণের হাতে উঠলো একটা কচ্ছপ। বিদ্যুৎ ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। কচ্ছপ অযাত্রা। সে কথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। নোনা জলের কচ্ছপের স্বাদই আলাদা।

নৌকোয় একটি মুর্গী রয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটি ছোঁয়া যাবে না। ওটা বনবিবির কাছে মনোরঞ্জনের মানত করা।

রাত্তিরে নৌকো চালানো হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ছজনের মধ্যে চারজনই এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে, কিন্তু দলনেতা হিসেবে মাধব বলেছিল, না। এর পর আর কোনো জন-বসতি নেই, এখানে ডাকাতদের অবাধ স্বাধীনতা। প্রথম কয়েকটা রাত অন্তত হাল-গতিক বুঝে নেওয়া দরকার।

খুব ছোট একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে এমনভাবে নৌকো বাঁধা হলো, যাতে বাইরে থেকে দেখাই যাবে না। দুজন দুজন পালা করে রাত জেগে পাহারা দেবে। কচ্ছপের মাংসটা জমে গেল দারুণ, ভাত কম পড়ে গেল মাধবের, যে-টুকু ঝোল বাকি ছিল তাতেই সে আর এক থালা ভাত মেরে দিতে পারতো।

গান গাওয়া নিষেধ বলে আগেই ঘুমিয়ে পড়লো মনোরঞ্জন, সে আর নিরাপদ পাহারা দেবার পালা নিয়েছে শেষ রাত্রে। কিন্তু মাঝ রাতেই জেগে উঠতে হলো সবাইকে। বিদ্যুৎ জাগিয়ে দিল, খুব কাছ দিয়ে নৌকো যাচ্ছে দুখানা। বিদ্যুতের ফিসফিসে গলা কেঁপে যাচ্ছে ভয়ে। সাধুচরণ আর মনোরঞ্জন পাটাতনের তলা থেকে বার করলো দুখানা লাঠি। কিন্তু ঘুম চোখেই মাধব নৌকো দুখানা এক নজর দেখে নিয়ে বললো, কী আপদ। এর জইন্যে কাচা ঘুমডা ভাঙ্গাইয়া দিলি। ও কিছু না, অরা চোরাই কাঠের ব্যাপারী।

মাধব ভুক্তভোগী, সে ডাকাতের নৌকো চেনে। একটা দল এদিকে ডাকাতি করে পালিয়ে যায় জয় বাংলায়, আবার জয় বাংলায় ডাকাতি করে চলে আসে এদিকে। ওদের হাতে পড়লে ঐ লাঠিতে কুলোবে না, ওদের কাছে বন্দুক থাকে।

নির্বিঘ্নে রাত কেটে গেল। আবার যাত্রা। মরিচঝাঁপি থেকে কিছু শুকনো ডালপালা তুলে নেওয়া হলো, জ্বালানির জন্য। এ জঙ্গলে ভালো জাতের কাঠ বিশেষ কিছু বাকি নেই, বাঙ্গাল-রিফিউজিরাই কেটে সাফ করে দিয়ে গেছে প্রায়।

এবার আসল দিনটার কথা। সেটা চতুর্থ দিন। তার আগে একদিন মাঝ নদীতে পেট্রোলের লঞ্চ অর্থাৎ পুলিস পেট্রল ওদের নৌকো আটকায়। সেদিন বড় আনন্দ হয়েছিল মাধবের। পুলিসের নাকের ডগায় দেখিয়ে দিল পারমিটের কাগজখানা। এর আগে আর কোনোবার সে এমন গর্বোন্নত মুখে পুলিসের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। পুলিসরাও চিনতে পেরেছে মাধবকে। তাকে বে-কায়দায় না পেয়ে বড়ই নিরাশ হয়েছিল তারা।

এর পর কাহিনীর মধ্যে খানিকটা কাবচুপি আছে। মাধব মিথ্যে কথা তেমন ভালো করে সাজিয়ে বলতে পারে না বলে সে হঠাৎ কাশতে শুরু করে দিল। কাশির দমকে বেঁকে গিয়ে কোনোরকমে বললো, এবার তুই বল, সাধু…আপনেরা অর মুখ থেইক্যা শোনেন।

সাধুচরণ বললো, মঙ্গলবার দিনকে সকাল নটায় পৌঁছে আমরা সবাই বনবিবির পূজো দিলাম। মনোরঞ্জন সকালে চা খায় নি, উপোষ করেছিল, স্নান-টান সেরে ভক্তি ভরে পূজো দিয়েছে ‥। সে বেলাটা আর কাজে হাত না দিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর… প্রথমেই শুভ লক্ষণ ‥দেখি যে সামনের একটা গরাণ গাছের মাথায় বসে আছে একটা কাঁক, এই অ্যাত্ত বড় ‥

কাক নয়, কাঁক। খুব লম্বা গলা ওয়ালা একজাতীয় পাখি, সাদায় কালোয় মেশানো, কাটলে অন্তত সোয়া কেজি মাংস হবে, বড়

লোভনীয়, বড় সুস্বাদু। সুতরাং কাঁকের নাম শুনে এই শোকের উঠোনেও শ্রোতাদের মন আনচান করে উঠলো।

—মারতে পারলি সেটাকে ?

—নাঃ! নিরাপদ গুলতি নিয়ে গেসল, কিন্তু টিপ করার আগেই সে সুম্বন্ধির ভাই উড়ে পালালো।

সুন্দরবনের সব জঙ্গলই বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। নৌকোয় বা লঞ্চে চেপে পাশ দিয়ে গেলে তিন নম্বর ব্লক বা সাত নম্বর ব্লকে কোনো তফাৎ নেই। তবে পারমিটের এলাকা মানেই বারোয়ারি। আর পাঁচজন আগে থেকেই এসে সেখানকার ভালো ভালো মাল তুলে নিয়ে গেছে। ওদের পারমিট ছিল ঐ তিন নম্বর ব্লকে গাছ কাটার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে আসল জঙ্গল হলো সাত নম্বর ব্লক। শুধু কাঁক কেন, শামুক খোল, কাস্তে-চরা, বাটাম পাখির ছড়াছড়ি সেখানে। ঝাঁকের পর ঝাঁক, গুলতি চালালে একটা দুটো মরবেই। আর ভালো ভালো জাতের কাঠও আছে ঐ সাত নম্বরেই। মোটা মোটা হ্যাঁতাল আর গরাণ—এই দুজাতের কাঠে ভালো দাম পাওয়া যায়। সুন্দরী গা· এ তল্লাটে নেই বললেই চলে, সবই পড়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনে, এ দিকে যা কিছু আছে তা ঐ সাত নম্বর ব্লকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের মতনই, নিষিদ্ধ জঙ্গলের প্রতিই মানুষের বেশী আকর্ষণ। আর, তিন নম্বর ব্লক থেকে সাত নম্বর ব্লক কতটুকুই বা দূর, আড়াআড়ি দুটো নদী পার হয়ে তিনটে ট্যাক ছাড়ালেই হয়। এদিকে পেট্রোলের লঞ্চ বা নৌকোও তেমন আসে না। তিন নম্বর ব্লকে বনবিবির পুজো দিয়ে ওরা রওনা হয়েছিল সাত নম্বর ব্লকের দিকে। সুতরাং ওদের অভিযান সাত নম্বর ব্লকে হলেও সাধুচরণ সুকৌশলে বর্ণনা দিতে লাগলো তিন নম্বরের নিরীহ জঙ্গলের।

তিন নম্বরে বাঘ নেই। সাত নম্বরে যদি বাঘ না থাকবে, তা হলে সেটা নিষিদ্ধ জঙ্গল হবে কেন? সাত নম্বর একেবারে কোর-এরিয়ার মধ্যিখানে। তবু পাঁচ পাঁচটা জোয়ান ছেলে যদি সেখানে যেতে চায়, মাধব আপত্তি করতে পারে কি? মাধব পুলিসের ভয় পায়, ফরেস্ট অফিসের বাবুদের ভয় পায়, এমন কি ডাকাতদেরও ভয় পায়। কিন্তু কোনো জঙ্গলকেই সে ভয় পায় না। সে একলা যমেরও মুখোমুখি হতে পারে, যদি যম প্রকৃত বীর পুরুষের মতন খালি হাতে একা লড়তে আসেন তার সঙ্গে। যদি তিনি বড়মিঞার ছদ্মবেশে আসেন, তাতেও মাধবের কুছ পরোয়া নেই।

মাধব বার বার ওদের বাজিয়ে নিয়েছিল। সাধুচরণ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, সুভাষ আর মনোরঞ্জন একবাক্যে রাজি। একে তো পাখির মাংস খাওয়ার লোভ, তা ছাড়া এত কষ্ট করে এসেছে যখন, তখন নৌকো ভর্তি ভালো ভালো কাঠ নিয়ে না ফিরতে পারলে আর লাভ কী? এই লাভের চিন্তাটাই মাধবকে বেশী টানে।

নিয়ম হলো, নৌকো বাঁধবার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জঙ্গলটা বুঝে নিতে হয়। সাত নম্বর ব্লকে অনেক বাঁদর আছে, এই বাঁদরের ডাকের ধরণ শুনে টের পাওয়া যায় বাঘের গতিবিধির। সব লক্ষণই বেশ ভালো।

আশ্চর্য ব্যাপার। বাঘের নামে যেমন গা ছম্ ছম্ করে, তেমনি আকর্ষণও করে। দেরি সহ্য হয় না, মনে হয়, কখন জঙ্গলে নামবো। সাধুচরণ আর নিরাপদ অস্থির হয়ে বলেছিল, জঙ্গল তো একেবারে পরিষ্কার। তা বলে এবার ··। মাধব তাদের ধমক দিয়ে বলেছিল, দাঁড়া! এত হুড়োহুড় কিসের?

নদী এখানে খুব চওড়া। এপারে ওপারে বনের সবুজ রেখা। আকাশ যেন এখানে বিশাল ডানা মেলে আছে। পাড়ের থকথকে কাদার মধ্যেও উঁচু উঁচু হয়ে আছে বড় বড় শূল। তারপর বহু ছোট ছোট হেঁতালের ঝোপ। জোয়ারের সময় ঐ গাছগুলোর অর্ধেক

পর্যন্ত জলে ডুবে যায়। আর এই হেঁতালের হলদে-সবুজ ঝোপের আড়ালেই বাঘের লুকিয়ে থাকার সবচেয়ে ভালো জায়গা।

সন্ধের সময় পৌছে ওরা পাড় থেকে অনেক দূরে নৌকো বেঁধে রইলো। বাঘ সাঁতরেও আসতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তো দুজন দুজন পালা করে জেগে থাকবেই। আসুক না একবার সাঁতরে, জলের বাঘকে পিটিয়ে মারা বড় আরামের। ওদের প্রত্যেকেরই মনে একবার অন্তত একটি বাঘ মারার ব্যাপারে অংশ নেওয়ার সুখস্বপ্ন লুকিয়ে আছে। বাদা অঞ্চল এমন মানুষ একটিও নেই যে পাশ ফিরে পড়ে থাকা নিহত বাঘের মুখ দেখে জীবনে অন্তত একবার আমোদ করতে চায় না। এরা জানে, না ডেনমার্কের যুবরাজের মনের খবর।

সারারাত জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। এমন কি বাঁদরদের হুপো-হুপিও নেই। শুধু সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র। ট-র-র-র। ট-র-র-র। কেউ কোনদিন এই জলতরঙ্গ পাখি চোখে দেখেনি। শুধু রাত্তিরবেলা ডাক শোনা যায়।

ভোরবেলা কিছু দূরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে ওরা তাজ্জব। মাধব তক্ষুনি চার হাতে বৈঠে চালিয়ে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু সামনের বাঁক ঘুরে একটি নৌকো এদিকে আসতেই ওরা আশ্বস্ত হলো। পুলিশ বা বন রক্ষী নয়, ডাকাতও নয়, অন্য নৌকোটির হাল ধরে আছে কুমীরমারীর দাউদ শেখ। ওদের সবারই চেনা। বেশ বড় একটা পার্টি নিয়ে এসেছে দাউদ শেখ, এদেরও চোরাই কাঠের ধান্দা। দুটি নৌকো পাশাপাশি এলে বিড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। ওদের দলে একজন মউলে রয়েছে, সে মধুর সন্ধান দিতে পারবে।

তা হলে তো একেবারে নিশ্চিন্ত। এত মানুষ জন দেখলে বড় মিঞার বাবাও এদিকে আর ঘেঁষবে না। মাধব তক্ষুনি ঠিক করে নিল, খুব চটপট কাজ সারতে হবে, এখানে তিন চার দিনের বেশী থাকা নয়। সারাদিন খেটে এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে বারো

আনা মতন কাঠ। বাকি চার আনার জন্য ফিরে যেতে হবে তিন নম্বর ব্লকে, সেখান থেকে আবাব কিছু কাঠ কেটে সেই কাঠ চাপা দিতে হবে ওপরে।

দায়ুদ শেখের নৌকো খুঁটি গাড়লো ওদের দৃষ্টি সীমার দূরত্বের মধ্যেই। তবে ওরা যাবে বাঁ দিকে আর এরা যাবে ডান দিকে, যাতে জঙ্গলের মধ্যে নেমে দুদলে গুঁতোগুঁতি না হয়। শুধু মৌচাকের সন্ধান যে-দলই পাক, অন্য দলকে তার সন্ধান দিয়ে অর্ধেক ভাগ দিতে হবে, এই রইলো মৌখিক চুক্তি।

যত সহজে ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয় পাখি মারা। যে কাঁক পাখিটার কথা সাধুচরণ বললো তিন নম্বর দেখেছে, আসলে তো সেটা ছিল সাত নম্বরে একটা গরাণ গাছের মাথায়। এই পাখিগুলোর অদ্ভুত স্বভাব, এরা গাছের মগডালে ছাড়া বসে না। নিরাপদ গুলতি চালিয়ে সেটাকে তো মারতে পারলোই না, বরং সেই তোড়জোড়ে উড়ে গেল কাছাকাছি চরের ওপরে বসে থাকা এক ঝাঁক কাস্তে-চরা।

রাত্রের হিমেল হাওয়া লেগে সুভাষের গায়ে বেশ জ্বর এসে গেছে। এবং এক রাতের জ্বরেই মুখটা বেশ ফুলে গেছে তার, চোখ দুটো পাকা করমচার মতন। বেশ চিন্তার ব্যাপার। এই অবস্থায় তার পক্ষে গাছ কাটতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার তাকে নৌকোয় একা রেখে যাওয়া যায়ই বা কী করে? একজন কেউ থেকে যাবে তার সঙ্গে? কে থাকবে, মনোরঞ্জন! বিদ্যুৎ! সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ কারুরই থাকাব ইচ্ছে নেই। জঙ্গলে পা দেওয়ার জন্য চাপা উত্তেজনা যেন আর দমন করতে পারছে না। সুভাষ বললো, না, নয় আমি একাই থাকবো! দিনের বেলা··· হেঃ···তাতে আবার ভয়? সত্যিই দিনের আলোয় কোনো ভয় মনে আসে না। সুভাষকে রেখে যাওয়া হলো নৌকোয়, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সে-ই করবে।

কুড়ুল আর করাত নিয়ে বাকিরা নেমে পড়ে নৌকো থেকে।

লুঙ্গি পরা, খালি গা, খালি পা। এদের মধ্যে একমাত্র মাধব ছাড়া বাকি চারজনই কিন্তু মাঝে মাঝেই শৌখিন জামা গায়ে দেয়, সাধুচরণ এবং মনোরঞ্জন ফুল প্যান্টও পরে। ক্যানিং-এ কখনো সিনেমা দেখতে গেলে ওরা বেশ সাজগোজ করেই যায়। মনোরঞ্জন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল বিয়ের সময় রবারের কাবুলি জুতো পায়ে দিয়ে।

হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্য দিয়ে ওরা বেশ ফুর্তির সঙ্গেই এগিয়ে যায়। শূলগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গেলেও ভাঙ্গা শামুক-ঝিনুকে একটু আধটু পা কাটবেই। ওপরে উঠে আসার পর বোঝা যায় বনটি বেশ নিবিড়, এগোতে হবে ঝোপ ঝাড় ঠেলে। সামনের প্রথম সারির হেঁতালের ঝোপের ওপর কয়েকবার কুড়ুলের ঘা দিতেই ভন ভন করে ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক মশা। একটা ছোট গো-সাপ সরসরিয়ে জলে নেমে পড়ে। এ সবই ভালো লক্ষণ।

জঙ্গলের মধ্যে এগোতে হয় লাইন করে। মাধবই সবচেয়ে ভালো চেনে জঙ্গল, সেই জন্য সে আগে আগে যায় পথ তৈরি করে। কোথাও কোনোও শব্দ নেই, তাদের পায়ের শব্দ ছাড়া। ভালো গাছের জন্য যেতে হবে একটু ভেতরে, যত দূর পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে, সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে।

দাউদ শেখের পার্টি এখনো পাড়ে নামে নি। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা। ওদের তুলনায় মাধবের দলটির অবস্থা অনেক ভালো, যদি দৈবাৎ পেট্রলের নৌকো এসেও পড়ে, ওরা পারমিট দেখিয়ে বলবে, ভুল করে তিন নম্বরের বদলে সাত নম্বর ব্লকে এসেছে, নদী চিনতে পারে নি। তার জন্য বড় জোর দশ-বিশ টাকা প্রণামী দিতে হবে, নৌকো কেড়ে নেবে না, জেলেও দেবে না। দাউদ শেখ এসব ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া।

একটা গাছেও ওরা কোপ মারে নি। মাধব অগাছা সাফ করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারপর সাধুচরণ, তারপর বিদ্যুৎ, তারপর মনোরঞ্জন, সব শেষে নিরাপদ। নিরাপদর কোমরে গুলতিটা

গোঁজা। তার দু চোখ এদিক ওদিক ঘুরছে পাখির সন্ধানে। একটু বুঝি সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মাথায় খুব জোর কেউ ঘুঁষি মারলে চোখের সামনে যেমন খানিকটা হলুদ দেখা যায়, সেইরকমই একটা হলুদের ঝিলিক শুধু দেখতে পেল নিরপদ, তারপর একটু দূরের একটা ঝোপে হুড়মুড় শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল শোরগোল শোনা গেল দাউদ শেখের নৌকো থাকে।

কী হয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরেই নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবা রে! মা রে!

সাধুচরণের বর্ণনায় এইখানে বাধা দিয়ে মাধব বললো, আমি যেই সেই চিখৈর শুনিছি, অমনি আর চোক্ষের পলকটি না ফেইল্যা পিছন ফিরাই রোকেলের মতন (লোক্যাল ট্রেনের মতন) ছুটে আসিছি। দেখি যে নেরাপদডা ভেউ ভেউ কইরা কান্দে। আমি যত জিগাই কান্দোস ক্যান—

বিদ্যুৎ বললো, এই যে দেখুন, নিরাপদটা এইরকম একটা বাঁশ-পাতার মতন থরথর করে কাঁপছিল।

নিরাপদ বললো, আমি কি করবো। কিছুই ঠিক দেখিনি। কিছুই ঠিক বুঝি নি, তবু এমনি-এমনিই আমার শরীরটা কাঁপতে লাগলো, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমন আমার জীবনে কখনো হয়নি।

সাধুচরণ বললো, আমরা তখনো ভাবছি দাউদ শেখদেরই কোনো বিপদ হইয়েছে।

সুভাষ বললো, আমিও নৌকো থেকে শুনছি দাউদ শেখরাই চ্যাচাঁচ্ছে বেশী। ওরা শুধু বলছে বড় মামা। বড় মামা। সেই শুনে তো আমারও কাঁপুনি ধরে গিয়েছে।

মাধব বললো, আমিই প্রথম কইলাম, মনা কই? মনোরঞ্জন?

সবাই ঠিকঠাক আছে শুধু মনোরঞ্জন নেই। সে সকলের সামনে

ছিল না, একেবারে পিছনেও ছিল না, তবু বাঘ তাকেই বেছে নিল।

বর্ণনা শুনতে শুনতে মহাদেব মিস্তিরি বলে উঠলো, অ্যাঁ? বলিস কী? শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

বিস্মিত হবারই কথা। কাহিনীটি যে এত সংক্ষিপ্ত হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারে নি। বাঘের গর্জন নেই, ঝটাপটি, লড়ালড়ি কিছু হলো না, এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল? ওদের অভিযান শুরু হতে না হতেই সারা?

এই সময় আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েমহলে। কামোঠ-কুমীর, জোঁক-সাপ-বাঘ, ভূত-পেত্নী-কলেরা নিয়ে ঘর করতে হয় বাদার মানুষদের, অপঘাতে মৃত্যুর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যার বিয়ের পর এক বছরও পোরে নি, সেই মনোরঞ্জনকেই টেনে নিল নিয়তি?

মহাদেব মিস্তিরি ঠোনা মেরে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কিস্যু করতে পারলে না?

মাধব উত্তর না দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাধুচরণ আবাব শুরু করলো তার বিবরণ।

সম্বিৎ ফিরতেই সকলে হাঁপর ঝাঁপড় করে দৌড়ে ফিরে এলো নৌকায়। কিন্তু একথা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দেবে যে শুধু মাধব ফেরে নি। এই যে মানুষটা এখন চুপ করে বসে আছে, এরই তখন কি সাংঘাতিক রূপ! আবলুশ কাঠের মতন শক্ত হাতে কুড়ুলটা উঁচু করে তুলে সে পাগলেব মতন চিৎকার করছিল: কোথায় গেলি শ্‌শালা, আয়। ওরে পুঙ্গীর ভাই, ওরে চুতমারানির ব্যাটা, আয়। ওরে হারামজাদা, ওরে শুয়ারকি বাচ্চা, শোগামারানি…

দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মতন সে তাণ্ডব নাচতে লাগলো বনের মধ্যে। আর গালাগালির ঝড় তার মুখে। সবাই মাধবের নাম ধরে ডাকছে। সে শুনতেই পাচ্ছে না। তারপর খানিক বাদে দাউদ শেখের দল আর সাধুচরণরা এক সঙ্গে মিলে গেল মাধবের কাছে।

মাধবের তখন চোখ দুটি লাল টকটকে, মুখের পাশ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। কেউ তাকে ধরতে গেলে সে হাত ছ্‌টকে চলে যায়। অন্যরাও তখন সকলে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল প্রবলভাবে। এরকম শুনলে বাঘ শিকার ফেলে পালায়।

কিন্তু অত চ্যাঁচামেচি কিংবা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যায়নি।

সাধুচরণ বা মাধবেরা তো কেউ বাঘটাকে চোখেও দেখেনি, নিরাপদ পাখি-খোঁজায় একটু অন্যমনস্ক ছিল, সে শুধু দেখেছে একটা হলুদ ঝলক। দাউদ শেষ দাবি করে যে সে বাঘের পেছন দিকটা একবার দেখেছে ঝোপের মধ্যে। ঐ রকম সা-জোয়ান চেহারা মনোরঞ্জনের, তাকে মুখে নিয়ে বাঘটা একেবারে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল?

—কিন্তু তুমি তো গুণিন, মাধব? তুমি থাকতে সেখানে বাঘ এলো। তুমি আগে মন্তব পড়ে জঙ্গল আটক করোনি?

একটা ঠিক, মাধব একজন গুণিনও বটে। সে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রও জানে। সে মন্ত্র দিয়ে গণ্ডি কেটে দিলে সেখানে কোনো বাঘ ঢুকলেই নিশ্চল হয়ে পড়বে। সেইজন্যই তো সে জঙ্গলকে ভয় পায় না।

মাধব পিছনের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, হ, আটক করছিলাম। আমার মন্তর খাটে নাই।

—খাটে নি তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন এমন হলো?

এবার মাধব একটা অদ্ভুত যুক্তি উপস্থিত করলো।

সে চিক করে বাঁ পাশে থুতু ফেলে বললো, কী জানি! বোধ হয় সেইদিন আমার জন্মদিন আছিল।

—জন্মদিন?

—হ। আপনি জানেন না, জন্মদিনে কোনো গুণিনেরই মন্তর খাটে না?

—তা তোমার যে সেদিন জন্মদিন, তুমি আগে জানতে না ?

—ক্যামনে জানবো ? মায় মরছে সেই কোন ছুটকালে, আর আমার বাপে আমারে দুই চক্ষে দ্যাখতে পারতো না। আমারে খ্যাদাইয়া দিছিল। আমারে আমার জন্মদিনের কথা কে কইয়া দেবে ? জন্মদিন তো দূরে থাক, নিজের জন্ম বারটাই জানি না! আমি আদাড়-ছাদাড়ের মানুষ, কোনোরকমে খুদ কুড়ো খেইয়ে এতগুলান দিন বেঁচে আছি আর কতদিন টানতে পারবো কে জানে···

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মাধব। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের দিকে।

বাসনার বাসা বদল

পরিমল মাষ্টারের ঘুম ভাঙলো ধুম জ্বর নিয়ে। এইজন্যই সারা রাত ভালো করে ঘুম আসে নি, এপাশ ওপাশ ছটফট করেছেন। বড় বিচ্ছিরি এই দখনে জ্বর, যখন তখন আসে, একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না।

চোখ মেলার পর একটা হাত দিয়ে কপালটা অনুভব করেই তাঁর ঠোঁট তেতো হয়ে গেল। তারপরই তাঁর মনে পড়লো, আজ অরুণাংশু আসবে। যদি ভোরের ট্রেনেই রওনা দেয় তা হলে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আড়াইটে তিনটে হবে। কতটা দূরত্ব হবে কলকাতা থেকে? মাইলের হিসেবে ষাট-সত্তর মাইল, বড় জোর আশী, পাখি-ওড়া মাপে। এই দূরত্ব পেরুতেই পাকা দশ ঘণ্টা লাগে, তাও যদি ঠিক ঠাক লঞ্চ ধরা যায় ক্যানিং থেকে। একটা লঞ্চ না পেলেই সারা দিন কাবার।

সুলেখা তখনও জাগেননি। ভোরবেলা উঠে বাগানে পায়চারি করা পরিমল মাষ্টারের স্বভাব। মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে, শিশিরভেজা মাটির ওপর খালি পায়ে হাঁটলে তা চলে যায়, মন প্রসন্ন হয়। আজ সকালে বাগানে যাওয়া হবে না। বাগান মানে কাঁচা লঙ্কা ও বেগুনের ক্ষেত, অন্য সময় হয় উচ্ছে বা শশা বা ঢ্যাঁড়শ, সামনের দিকে কয়েকটা জবা ফুলের গাছও আছে অবশ্য।

আজ অরুণাংশু না এলেই ভালো হতো। শহরের সংস্পর্শ পেতে আজ পরিমলের একটুও ইচ্ছে করছে না। আবার চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। ঘুম নয় একটু একটু আবল্লী আসে, তাতে চলচ্চিত্রের মতন ছোট ছোট স্বপ্ন।

—তোমার চা।

এরই মধ্যে কখন স্নান সারা হয়ে গেছে সুলেখার। তাঁর ভিজে চুলের প্রান্ত থেকে জল ঝরছে। স্নানের ঠিক পর সব মেয়েদেরই কেমন যেন পুণ্যবতী পুণ্যবতী দেখায়। সুলেখার দিকে তাকিয়ে শীত করে উঠলো পরিমলের।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়ে সিগারেটের টানটা ফিরে এলো। সুলেখার সামনে উচ্চারণও করা যাবে না। অরুণাংশু এলে অবশ্য প্রচুর সিগারেট খেতে হবে। অরুণাংশু নিজে যতগুলো খায়, অন্যদেরও খেতেই হবে ততগুলো। নিজের প্যাকেটই হোক আর অন্যের প্যাকেটই হোক, হাতের সামনের প্যাকেট খুলে সে মুড়ি মুড়কির মতন সিগারেট ছড়ায়।

সুলেখার নিষেধের জন্যই নয়, পরিমল নিজেই চান সিগারেট ছাড়তে। স্বাস্থ্যের ব্যাপার তো আছেই, তা ছাড়া অযথা বাজে খরচ, এবং কেন এই নেশার দাসত্ব? কিন্তু সিগারেট যেন ঠিক মশার মতন। বন্দুক দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক মারা যায়। কিন্তু মশা যেমন শেষ করা যায় না, তেমনি ছাড়া যায় না এই সবচেয়ে ছোট নেশাটা।

পরিমল অপেক্ষা করছেন কখন সুলেখা নিজে থেকে বুঝতে পারবেন। তার আগে তিনি বলবেন না তাঁর জ্বর হয়েছে।

এক সময় খবরের কাগজ ছাড়া সকালের চা খাওয়া কল্পনাই করা যেত না। এখানে কাগজ আসে দুপুর তিনটের লঞ্চে। না পড়লেও হয় সে কাগজ।

হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ট্রানজিস্টার রেডিওটা তিনি চালিয়ে দিলেন। রেডিওতে যে এত চাষ-বাস নিয়ে কথাবার্তা হয়, শহরে থাকতে কোনোদিন তা টের পাওয়াই যায় নি। অথবা এতটা বোধহয় আগে হতো না। মন দিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন চাষী-ভাইদের জন্য পাট চাষ বিষয়ে পরামর্শ। খুব একটা ভুল বলে না, অভিজ্ঞ লোকদেরই ডাকে রেডিও। শুধু একটা জিনিস ওরা বোঝে

না। যেখানে বৃষ্টি হয়নি, বিদ্যুৎ নেই বলে যেখানে পাম্প চলে না, নদীর নোনা জল সেখানে চাষের কাজে লাগাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানকার চাষীরা রেডিওতে অভিজ্ঞ লোকদের মুখে সময় মতন জল সেচের পরামর্শ শুনে কতটা উপকৃত হবে?

—তুমি উঠবে না?

—হ্যাঁ এই আর একটু, কটা বাজে?

সময় জানবার জন্য ঘড়ি দেখতে হয় না। রেডিওর অনুষ্ঠানগুলো প্রতিদিন এক ছকে বাঁধা, বাংলা খবরের পর স্থানীয় সংবাদ, তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত, অর্থাৎ পৌনে আটটা। এতক্ষণ কোনোদিন শুয়ে থাকেন না পরিমল।

—তোমার জ্বর হয়েছে?

গায়ে হাত না দিয়েও কী করে টের পেলেন সুলেখা? সত্যিই কি মেয়েদের সপ্তম ইন্দ্রিয় বলে কিছু ব্যাপার আছে! আসলে সুলেখারও একটু একটু জ্বর হয়েছে। প্রথম দু-এক দিন এরকম জ্বরকে উপেক্ষা করেন সুলেখা, সেই জন্যই জোর করে স্নান করেছেন। পরিমলের চোখের ছলছল ভাবটা সুলেখার নজরে পড়েছে এইমাত্র।

পরিমলেব অসুখ-ভীতি বেশী, তাই স্বামীর স্পর্শ এড়িয়ে চলছেন সুলেখা।

—কী জানি, গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—গ্রামসেবকদের মিটিং কটায়? এগারোটায় না?

—যদি শরীরটা এরকম থাকে তা হলে ওদের একটা খবর পাঠাতে হবে, মিটিংটা বন্ধ রাখার দরকার নেই, ওরা নিজেরাই আলোচনা করুক—

বাইরের বারান্দায় দুজন লোক বসে আছে। ওরা কোনো খবর দেয় না, নিজেদের উপস্থিতির কথাও জানায় না, বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে থাকে চুপচাপ। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণি যখন বাইরে বেরুবে, তখন তো কথা হবেই।

ইলা নামে একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করে। সে দাসী নয়, সে স্কুলে যায়, রাত্তিরবেলা হ্যারিকেন জ্বেলে সে পড়তেও বসে। মহিলা সমিতিতে সেলাইয়ের কাজও শেখে, আবার রান্না-বান্নায় সুলেখাকে সাহায্যও করে। ইলার বাবা ছিল বিখ্যাত ডাকাত বীরু গোলদার।

সেই বীরু গোলদারের নামে কত রোমহর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে এখনো। পুলিশের গুলি খেয়ে রায়মঙ্গল নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল বীরু গোলদার, তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। অনেকের ধারণা সে আজো বেঁচে আছে, ঘাপটি মেরে আছে কোথাও। পাঁচ বছর বয়সের অনাথা মেয়ে ইলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সুলেখা। এখন সে বাড়ির মেয়ের মতন।

বাইরের লোক দুটিকে দেখতে পেয়েছে ইলা। সকাল নটার মধ্যে যারা এ বাড়িতে আসে তারা চা পাবার অধিকারী। বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বারান্দায় এমন ভাবে এসে বসবেও না। এটা তো আড্ডাখানা নয়।

দুটি গেলাসে করে চা এনে ইলা ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। ওরা তবু মুখ খোলে না। এমন কি নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, কারণ বলবার মতন কিছুই নেই। একেবারে চুপ। শুধু সুলুপ সুলুপ শব্দে চায়ে চুমুক দেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে সুলেখা একবার বাইরে এলে ওদের মধ্যে একজন বললো, দিদিমণি, আমরা একবার নাজনেখালিতে যাস্থি, মাস্টারমশাই কি যাবেন?

—কেন সেখানে কী আছে? নাজনেখালিতে পরশুদিন পাড়া-মিটিং হয়ে গেছে না?

—তা তো হয়ে গিয়েছে। আমরা যাবো একবার বিষ্টুপদ খাঁড়ার বাড়িতে। তার ছেলে, সেই যে একবার ভাস্কর পণ্ডিতের পার্ট করেছিল, আমাদের হাটখোলায় যাত্রা হলো, আপনিও দেইখে ছিলেন...

—হ্যাঁ, কী হয়েছে তার ?

—তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে নাকি।

এমন আলতোভাবে ওরা সংবাদটি দেয় যেন কারুর বাড়ির গাভিন গোরুর বাচ্চা হওয়া কিংবা শরষে খেতে শুঁয়োপোকা লাগার মতন নৈমিত্তিক ব্যাপার!

সুলেখার প্রথমেই মনে পড়ে গত রাত্রির সেই নদী-পেরুনো কান্নার আওয়াজের কথা। নাজনেখালির দিক থেকেই আসছিল বটে।

সুলেখাকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিতীয়জন খবরটিকে আরও একটু বিশ্বাসযোগ্য করে বললো, জঙ্গল মহলে গেসলো, মাধব মাঝির পার্টির সাথে···এই তো সিদিনকে বিয়ে হলো মনোরঞ্জনের।

—তোমরা কার কাছে খবর পেলে ?

—প্রথম খেয়ায় মাঝি এসে খবর দিল।

এইভাবেই খবর ছড়ায়। এতক্ষণে গোসাবা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।

লোক দুটিকে সুলেখা ডেকে আনলেন শোওয়ার ঘরে। পরিমল মাস্টার কাহিনীটা শুনতে শুনতেই খাট থেকে নেমে এলেন, দেয়ালের তাক থেকে ব্রাস নিয়ে তাতে পেস্ট মাখালেন। ভেতরে উঠোনের টিউবওয়েল থেকে দ্রুত দাঁত মেজে এসে তিনি বললেন, ইলা, আমায় একটা জামা দেতো মা।

নিজের ঈষদুষ্ণ ডান হাতটি এবার স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে সুলেখা বললেন, তোমার তো অনেক জ্বর দেখছি।

—ও কিছু হবে না, ঘুরে আসি একবার।

সুলেখা লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, এখন ভাঁটার সময় না ?

কোনো রূপক নয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নদীর জোয়ার-ভাঁটা অনুসারে এখানকার জীবন চলে। প্রতিদিন জলের দিক-পরিবর্তনের সময় তাই এদের সকলের মুখস্থ।

—হ্যাঁ, ভাঁটা পইড়ে গিয়েছে।

সুলেখা স্বামীকে বললেন, তোমায় যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।

—না, না আমার সেরকম কিছু হয়নি। আমি একবার চট করে ঘুরে আসবো।

সরাসরি নৌকোয় গেলে এই ভাঁটার সময় শুধু যাওয়া-আসাতেই সময় লাগবে অন্তত ছ ঘণ্টা। কারণ নদী-পথ অনেক ঘুরে। আর এখান থেকে কোনাকুনি কালী নদী পর্যন্ত হেঁটে গেলে, তারপর খেয়া পেরিয়ে আবার ওপারে হাঁটা, তাতেও লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা। যাওয়া মাত্র ফিরে আসা যায় না। অর্থাৎ এবেলা-ওবেলার ধাক্কা।

জোয়ারের সময় নদীর জল কানায় কানায় ভরা থাকে বলে জেটি থেকেই নৌকোয় ওঠা যায়। আর ভাঁটার সময় অন্তত এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গতেই হবে ডুটো খেয়া ঘাটেই। সেই জন্যই এত জ্বর-গায়ে স্বামীকে পাঠাতে দিতে রাজি নন সুলেখা।

গত আট দশ বছরের মধ্যে আশপাশের গ্রামের যে কোনো পরিবারের বিপদে-আপদে পরিমল মাস্টার গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। নাজনেখালির লোকেরা ধরেই নিয়েছে যে যে-কোনো সময় পরিমল মাস্টার এসে পড়বেন। সাধুচরণ তাই সকালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খানিকক্ষণ যুক্তি-বিনিময় হলো। ইলা সুলেখার পক্ষে। সে পরিমল মাস্টারকে যেতে দিতে চায় না, তাই জামা বার করে দেয় নি। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো পরিমলকেই। আজ স্কুলে ছুটি, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে হয়তো কাল সুস্থ হয়েও উঠতে পারবেন। নয়তো আজ অসুস্থ অবস্থায় এত হাঁটাহাঁটি করলে কাল আরও শরীর খারাপ হবেই।

পরিমল থেকে যেতে রাজি হলেন আরও এ জন্য যে হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, বিকেলের দিকে অরুণাংশু আসতে পারে। তার অনুপস্থিতিতে অরুণাংশু এখানে এসে যদি কোনো গণ্ডগোল বাধায়?

এই সব দিনে এই গ্রামের মধ্যে শহরের উপস্থিতি একেবারেই মানায় না।

সুলেখা ইলাকে বললেন আলুসেদ্ধ দিয়ে ফেনা-ভাত চাপিয়ে দিতে। নিজে বাড়ির অন্যান্য কাজ গুছিয়ে ফেলতে লাগলেন দ্রুত। এক ফাঁকে মহিলা সমিতি থেকেও ঘুরে এলেন। পাঁচটি মেয়ে যেখানে সেলাই কলে বসে লুঙ্গি বানাচ্ছে।

খানিকটা আপত্তি জানিয়ে তারপর সেই লোক দুটিও ফেনা ভাত খেয়ে নিল সুলেখার সঙ্গে। ওরা বেরুবার সময় পরিমল মাস্টার একজনকে বললেন, সাধুচরণকে ধরে আনিস আমার কাছে। ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে। তারই তো উচিত ছিল দৌড়ে এসে আমায় খবরটা দেওয়া, তাই না?

সুলেখা বললেন, তুমি আজ আর ওঠা-উঠি করো না, শুয়ে থাকো। ইলা তুই একটু দেখিস।

ওরা চলে যাবার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তুলে পরিমল মাস্টার ভাবলেন, ইস্, একটা খুব জরুরি কথা তো ওদের বলে দেওয়া হয়নি। মনেই পড়ে নি তখন। আচ্ছা, থাক এখন আর অন্য লোক পাঠাবার দরকার নেই, দু-একদিন পর তিনি নিজে গিয়েই বলবেন।

এক ঘণ্টা হেঁটে সুলেখা পৌঁছোলেন কালী নদীর খেয়াঘাটে। সেখানে একেবারে ভিড়ে ছয়লাপ। খেয়ার পারানি মাত্র পাঁচ পয়সা, তাও ধার রাখা যায়। নিয়মিত খেয়ার নৌকোটি ছাড়া একটি এস্পেশালও চালু হয়েছে। কারুর তো কোনো কাজ নেই, তাই এদিকের গ্রাম উজাড় করে সবাই চলেছে নাজনেখালিতে। সেখানে বাঘ নেই। বাঘে-ধরা মানুষটার লাশও নেই, তবু তো বাতাসে ভাসছে রোমাঞ্চকর গল্পটি।

ছেলে ছোকরারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে আগে খেয়া পার হবার জন্যে। বেশ একটি গোলমাল, হৈ-হট্টগোলের পরিবেশ। সুলেখা

ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে চলে এলেন। তাঁকে সবাই চেনে, সবাই একটু ভয়-ভয় করে। বুড়ো মাঝির বদলে তার দুই ছেলে, একজনের বয়েস তের-চোদ্দ, অন্যজনের বয়েস দশের বেশী না—এরা চালাচ্ছে নৌকো। বড় ছেলেটির দিকে চেয়ে সুলেখা বললেন, এই, তোর খেয়ায় কজন লোক যাওয়ার নিয়ম রে?

সে-রকম ধবা-বাঁধা নিয়ম কিছু নেই। বারো-চোদ্দ জন লোক উঠলেই নৌকোটা মোটামুটি ভর্তি হয়ে যায়। সেটা জেনে নিয়ে সুলেখা বললেন, খবর্দাব, বারো জনেব বেশী লোক একবারে নিবি না। এই করেই নৌকো ডোবে।

ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি যুবকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমবা ভাই একটা কাজ করো না। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা বন্দোবস্ত কবো, যাতে এক নৌকোয় বারোজনের বেশী না ওঠে। গত মাসেই একবার খেয়ার নৌকো ডুবেছিল—।

সঙ্গের একজন লোকের কাঁধে হাত দিয়ে, শাড়ী উঁচু করে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্য দিয়ে গিয়ে সুলেখা নৌকোয় উঠলেন। পা ধুলেন না। ওপারে গিয়ে তো আবার কাদায় নামতেই হবে।

মাথায় কয়েকটা সাদা চুল ঝিলিক মারতে শুরু করলেও সুলেখার বয়েস যে ছেচল্লিশ হয়ে গেছে তা বোঝা যায় না। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পরণে হলুদ-কালো মেলানো তাঁতের শাড়ী। কারুকে বকুনি দেবায় সময়েও সুলেখা মুখখানি হাসি হাসি করে রাখেন।

একটা লঞ্চ যাচ্ছে, বড় বড় ঢেউয়ে দুলে উঠছে খেয়ার নৌকো। লঞ্চটার নাম পড়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, মহারাণী এদিক দিয়ে যাচ্ছে কেন?

যাত্রীদের একজন উত্তর দিল, 'মহারাণী' তো এক মাস ধরে ভাড়া খাটছে টুরিস্ট ডিপার্টে।

কোনো কোনো রুটের সার্ভিস লঞ্চ মাঝে মাঝে সরকারের হয়ে

মাসিক ভাড়া খাটে। আশ্চর্য কিছু নয়। সাধারণ যাত্রী কমে গেলে বাঁধা নির্দিষ্ট আয়ের গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

ছুটির দিন, একদল শহরের ভ্রমণকারী লঞ্চে চেপে এসেছে সুন্দরবন দেখতে। এইদিকে কিছু দূর গেলেই সজনেখালি-পাখিরালা। যদিও মানসের হাঁসেরা শীতের শেষে অধিকাংশই উড়ে চলে গেছে। সজনেখালির টাওয়ারের ওপর উঠে এই সব নারী-পুরুষ উৎসুক ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে যদি বনের বাঘকে এক পলক দেখা যায়। দেখতে পেলে কত আনন্দ, কত বড় অভিজ্ঞতা। চিড়িয়াখানার বাঘ আর বনের সাবলীল বাঘে কত তফাৎ। একবার দেখতে পেলে সারা জীবন গল্প করার মতন ব্যাপার। সুলেখা একথা না ভেবে পারলেন না যে ঠিক এই সময়ই তিনি চলেছেন একটি বাঘে-খাওয়া মানুষের বাড়িতে। তিনি এর মধ্যেই শুনে নিয়েছেন যে সেই ছেলেটি মাত্র কিছু দিন আগেই একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। বাদা অঞ্চলে বিধবা হওয়া যে কী ব্যাপার, তা সুলেখা এর মধ্যে অনেক দেখেছেন।

যদি বছর খানেকের মধ্যেই শোনা না যায় যে ঐ বাসনা নামের বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তা হলে সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। অবশ্য মেয়েটি যদি বাঁজা না হয়।

সুলেখা দেখতে এলেন শোকের বাড়ি, এসে দেখলেন সেখানে বিপুল ঝগড়া চলছে।

ডলির একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। পুত্র শোক এখন দু টুকরো হয়ে রূপ নিয়েছে হিংসে আর রাগের। বাসনাকে আর সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তাকেই এই সর্বনাশের মূল মনে করে সে বাসনাকে এই দণ্ডেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বারবার সে বাসনাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ির বার করে দিচ্ছে আবার অন্যরা ফিরিয়ে আনছে তাকে। কুৎসিত গালাগালির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে ডলি। বাসনার শ্বশুর বিষ্ণুপদ থাকতে না পেরে একবার

পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে দু-একটা কথা বলতে গিয়েছিল ডলিকে। আর যায় কোথায়, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। স্বামীকেও যা নয় তাই গালাগালি শুরু করে দিল, এমনকি ডলি এমন ইঙ্গিতও করলো যে ছেলে মারা যাওয়ায় বাপ খুশী হয়েছে, তা তো হবেই, এমন ঢলানি বেওয়া মাগীর জন্য ··।

বাড়ীর চারপাশে গিসগিস করছে ভিড়, অনেকে গাছে উঠে দেখছে। বাঘের গল্প এখন দূরে থাক, দুই স্ত্রীলোকের মারামারির মতন এমন মনোহরণ দৃশ্য আর হয় নাকি? টানাটানির সময় ওদের কাপড় চোপড় বেসামাল হচ্ছেই, তাছাড়া স্ত্রীলোকের মুখে যৌন-কথা পুরুষেরা বেশী উপভোগ করে।

বাসনাও একেবারে চুপটি করে নেই। কাল শেষ রাত থেকে বেশ কয়েকবার মারধোর খাবার পর সেও মুখ খুলেছে। কবিতা বেচারি মা ও বৌদির মধ্যে পড়ে থামাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। অন্য প্রতিবেশিনীরাও একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছে। কর্তাব্যক্তিরা সব চুপ। মেয়েদের ঝগড়া তারা কী করে থামাবে?

এর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন সুলেখা।

যে-সব গালি-গালাজ বর্ষিত হচ্ছে, তা শুনলে সুলেখার মতন অন্য যে-কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়া নারীর কান লাল তো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে হবে। সুলেখা কিন্তু একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। খুব যে আশ্চর্য হয়েছেন, তাও নয়।

বিষ্টুপদ যেন খুব ভরসা পেল সুলেখাকে দেখে। কাছে এসে সারা শরীর মুচড়ে বললো, গ্যাখেন তো দিদিমণি, কী পেড়ার! মাথাটা একেবারে খারাপ হইয়ে গিয়েছে। যত বলি, অন্তত শ্রাদ্ধ-শান্তিটা চুকুক, তারপর না হয় বৌকে বাপের বাড়ি···কিছুই শোনে না। আপনি একটু বুঝ দিয়ে বলেন—

সুলেখা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডলি তাঁকেও একটা জঘন্য গালাগালি দিয়ে বসলো।

তিন-চারজন স্ত্রীলোক জোর করে জাপটে ধরে আছে ডলিকে। সুলেখা তীব্র দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ওকে বশ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না, গালাগালির স্রোত চলতেই লাগলো। ডলি সত্যিই যেন ক্ষ্যাপা হয়ে গেছে।

এবার সুলেখা বিষ্টুপদর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, হাঁ করে দেখছেন কী? দরকার হলে ওকে বেঁধে রাখতে হবে, এই কি পাগলামির সময়? এখন অনেক কাজ আছে না?

দিদিমণির কাছে উৎসাহ পেয়ে বিষ্টুপদ এবার চেপে ধরলো তার বউয়ের চুলের মুঠি, তারপর মনের সাধ মিটিয়ে তুখানা বিরাট চড় কষালো। তারপর সকলে মিলে ডলিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল বিষ্টুপদ। এখন ও চ্যাঁচাক যত খুশী।

দক্ষ সেনাপতির মতন সুলেখা এবার ভার নিলেন সব কিছুর। সাধুচরণকে পাওয়া না গেলেও খবর পাঠিয়ে অন্যদের ডেকে আনা গেল। এ বাড়িতে এত ভিড়ের মধ্যে কোনো কাজ হবে না, তাই মহাদেব মিস্তিরির পুকুরের বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলেন সুলেখা। মাধবের মুখ থেকে সমস্ত বিবরণটা আবার শুনে যাচাই করে নিলেন, কতটা সত্যি, কতটা অতিরঞ্জিত। মাধব যেখানে দ্বিধা করছিল, সেখানে খেই ধরছিল নিরাপদ।

সব শোনার পর সুলেখা অত্যন্ত পরিষ্কার উচ্চারণে বললেন, বেশ, এবার আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা চক্রান্ত করে মনোরঞ্জনকে খুন করে তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এখানে এসে রটিয়ে দিয়েছেন যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে।

ওরা চারজন স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইলো সুলেখার দিকে। এই

লেখা পড়া জানা, চশমা-পরা মেয়েছেলেটি একি সর্বনাশের কথা বলে ?

নিরাপদ প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললো, আমরা…আমরা মনোরঞ্জনকে খু…খুন করিছি ? কেন ?

—সে আপনারাই ভালো জানেন ?

—আপনি এ কি বলছেন, দিদিমণি। মনোরঞ্জন আমাদের বন্ধু, তাকে হঠাৎ কেন খুন করতে যাবো ?

—বন্ধু বুঝি কখনো বন্ধুকে খুন করে না ? শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সুরেন্দ্রের সঙ্গে নিরাপদর গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল না ?

সে নিরাপদ অন্য নিরাপদ, অন্য গ্রামের। সুরেন্দ্রকে খুন করে সে চালান হয়ে গেছে। তবু দিদিমণির মুখে খুনী নিরাপদর নাম শুনে এই নিরাপদর বুক কেঁপে ওঠে। তার ইচ্ছে করে দিদিমণির পা দুটি চেপে ধরতে।

নিজের স্বভাব অনুযায়ী মাধব তীব্র চোখে চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। সে ধরেই রেখেছিল, মাস্টারমশাইয়ের বউ কো-আপের ধারের প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু এ আবার কোন নতুন ঝামেলা ? তবু তার অভিজ্ঞ কানে যেন মনে হয়, দিদিমণি মুখে যা বলছেন, আসলে তা বলতে চাইছেন না।

—আপনি কী কইতাছেন খুল্যা কন তো! একই গেরামের এক চাষীরে শুধাশুধি খুন করবো, আমাগো কী মাথা খারাপ হইছে ?

বিদ্যুৎ বললো, মনোরঞ্জনকে বাঘে নিয়ে গেল, আমরা চোখের সামনে দেখিছি। টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পাইরলো না—

সুলেখা বললেন, যে বনে বাঘ নেই, সে বন থেকেও একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল ? এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ? তোমরা এই কজন ছাড়া আর কেউ সাক্ষী আছে ?

এবার দু-তিন জন এক সঙ্গে বলে উঠলো, আছে, আছে। দাউদ শেখ আর তার দলের লোকজন ছিল—

সুলেখা বললেন, তাই যদি সত্যি হয়, তোমরা সে-কথা ফরেস্ট অফিসে জানিয়েছো? থানায় খবর দিয়েছো?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বাদা অঞ্চলে বাঘে মানুষ ধরার সংবাদ হাওয়ার আগে রটে যায়। ফেরার পথে যতগুলো নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই শুনেছে। তারাই তো বার্তাবাহক। এ ছাড়া দত্ত ফরেস্ট অফিসে আসবার পথে ওরা থেমে এসেছে। সেখানকার বাবুরা জানেন।

কিন্তু কানে শোনা খবর দিয়ে কোনো সরকারি অফিসের কাজ চলে না। সে জন্য সুলেখা তৈরি হয়েই এসেছেন। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে তিনি বললেন, থানায় আর ফরেস্ট অফিসে তোমাদের সকলের সই করা লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে। তারপর সেই দরখাস্তের কপি পাঠাতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। সরকার বাঘ পোষার জন্য অনেক টাকা খরচ করছেন, সেই আদুরে বাঘ যদি কোনো মানুষ মারে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। তা ছাড়া, যে-জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য সরকার পারমিট দিয়েছেন, সেখানেও যদি বাঘ চলে আসে, তা হলে সেই দায়িত্ব সরকারের কাঁধেই বর্তায়।

বাংলায় দরখাস্তের বয়ান লিখে ওদের পড়ে শোনালেন সুলেখা।

অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেও মাধব জিজ্ঞেস করলো, ক্ষতিপূরণ কে পাবে? আমরা কিছু পামু না? আমাগো কি ক্ষতি কম হইছে।

সুলেখা বললো, আপনাদের কি নিজেদের কারুর নামে পারমিট আছে? নেই? আপনারা ভাড়া-খাটা লোক, আপনাদের কিছু দেবে না। মনোরঞ্জনের জন্যই কতটা কি পাওয়া যাবে কে জানে। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, সব দিক থেকেই হেরে যাওয়ার ব্যাপার। কেন যে ছেলে-ছোকরাদের কথায় সে নেচে উঠেছিল।

সই দিয়েই মাধব উঠে পড়লো। তার তো বসে থাকলে চলবে না, তাকে দিনের খোরাকি জোগাড় করতে হবে।

সাধুচরণের সই না পেলে চলবে না। সে কোথায় লুকিয়ে আছে বিদ্যুৎ জানে। সে গিয়ে ডাকতেই সুড় সুড় করে চলে এলো সাধুচরণ।

সে এসেই টিপ করে প্রণাম করলো সুলেখার পায়ে।

সুলেখা একটুক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন সাধুচরণের মুখের দিকে। তিনি জানেন, তাঁর স্বামী এই লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করেন। সাধুচরণকে জমি চাষের জন্য ঋণ দিতে চেয়েছেন পরিমল, এমনকি একটা চাকরি পাইয়ে দেবারও আশ্বাস দিয়েছেন, তবু এই লোকটি তাঁদের বাড়িতে যেতে চায় না কেন? দশবার খবর পাঠালে একবার আসে।

সাধুচরণ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, মাস্টারমশাইকে বলবেন, আমি কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, মনোরঞ্জনের বাবার নিজস্ব জমি কতখানি?

—তিন বিঘে না চার বিঘে রে নিরাপদ?

—তিন বিঘেটাক হবে।

সুলেখা মনে মনে হিসেব কষে নিলেন। তিন বিঘে এক-ফসলী জমি চাষ করে চারজনের নারী-পুরুষের একটা সংসার সারা বছর চালানো যায় না। মনোরঞ্জন ছিল জোয়ান চেহারার যুবক, সে বছরে কয়েকমাস জন-মজুরী খেটে কিংবা মাছের সীজনে বাগদা-পোনা ধরে আরও কিছু টাকা রোজগার করতো। মনোরঞ্জনের বাবা বিষ্টুচরণ যথেষ্ট বৃদ্ধ, তার পক্ষে একা নিজের জমি চষে ওঠাই শক্ত। পরিবারের আর তিনজনই স্ত্রীলোক। এছাড়া বিষ্টুচরণকে শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জমি বিক্রি না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সুলেখার বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জ্বর বাড়লে এরকম হয়। অনেকখানি পথ হেঁটে ফিরতে হবে।

মনোরঞ্জনের বাড়িতে আবার তাঁকে যেতে হলো একবার। আলাদা একটি দরখাস্তে বাসনার সই লাগবে। বাঘের মুখে নিহত ব্যক্তির পত্নী হিসেবে সে সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে।

কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাসনার দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানেই থাকতে পারবে?

এই একটি মাত্র সহানুভূতির কথায় বাসনার শোক-সাগর আবার উত্তাল হয়ে উঠলো। সে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ও দিদিমণি, আমায় এ যমপুরীতে ফেলে যাবেন না। ও দিদিমণি!

—তা হলে তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কিন্তু মনোরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-শান্তি হবার আগেই তার বিধবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তাও কি হয়, সবই হয়? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ভাল যখন বাসনাকে সহ্য করতে পারছেই না, তখন কয়েকটা দিন অন্তত দুজনের দূরে দূরে থাকাই ভালো। বিষ্টুচরণ ও প্রতিবেশী স্ত্রীলোকদের এই কথা বোঝালেন সুলেখা। সে জয়মণিপুরের মহিলা সমিতিতে দু-একদিন থাকুক, দরকার হয় সেখান থেকে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রাদ্ধের দিন না হয় এখানে আসবে আবার।

দুখানা করে শাড়ী-ব্লাউজ-সায়া পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে বাসনা চললো সুলেখার সঙ্গে। একদল লোক অকারণেই আসতে লাগলো পিছু পিছু। এত হৈ-হল্লায় বিরক্ত বোধ করছেন সুলেখা, কিন্তু তিনি জানেন, কিছু বলে লাভ হবে না। হাতে কারুর কোনো কাজ নেই বলেই এরকম একটা উত্তেজক ঘটনা ওরা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে দিতে চায় না। মাথার ওপর গন গন করছে রোদ। যদি দু-

একদিন আগে বৃষ্টি নামতো, তা হলে আর এত লোক হতো না, অনেকেই ব্যস্ত থাকতো মাঠের কাজে।

ঠিক সময়ে বৃষ্টি নামলে মনোরঞ্জন আর তার বন্ধুরা হয়তো যেতই না জঙ্গলে। অকালে-বেঘোরে প্রাণটা দিতে হতো না তাকে। প্রকৃতির সামান্য অন্যমনস্কতার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের নিয়তি।

খেয়াঘাটেও এত ভিড় জমলো যে নৌকোয় ওঠাই মুশকিল। সবাই বাসনাকে দেখতে চায়। যে-মানুষটাকে কয়েকদিন আগে বাঘে খেয়েছে, তার যুবতী বিধবা স্ত্রীও তো কম দর্শনীয় নয়।

ছায়া ঢলে-পড়া শেষ বেলায় বাড়ি ফিরে সুলেখা দেখলেন, জ্বরের ঘোরে পরিমল অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর কপালে জলপট্টি লাগিয়ে পাশে বসে হাওয়া করছে ইলা।

দ্বিতীয় অভিযান

এখনো কিছু কাজ বাকি আছে মাধবের, দলপতি হিসাবে তারই দায়িত্ব। আবার ফিরে যেতে হবে জঙ্গলে। মনোরঞ্জনের লাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা তার জন্য খোঁজ করতেই হবে প্রাণপণে। লাশের চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তো ভালোই, না পেলেও একটা ডাণ্ডা পুঁতে তাতে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা। যদি কারুকে বাঘে নেয়, তারপর তার সঙ্গীরা যদি এই শেষ কর্তব্যটুকু পালন না করে, তবে তারা নরকে যায়।

দ্বিতীয়বার যাত্রার জন্য মহাদেব মিস্ত্রি নৌকো ভাড়া নেবে না। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে কয়েক মুঠো করে চাল দেবে এই অনুসন্ধান দলটির খোরাকির জন্য। দুর্গাপূজা ফাণ্ড থেকে কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাবে পথ খরচা হিসেবে। নাজনেখালির পাশেই একটি মাছের ভেড়ি আছে। ভেড়িটির মালিক ছিল আগে বসিরহাটের এক ব্যবসায়ী। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে এবং নানান কৌশলে সেই ব্যবসায়ীটির ইজারা নষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ভেড়িটির মালিক গ্রামের সবাই, ঐ মাছ বিক্রির টাকায় হয়েছে দুর্গা পুজোর ফাণ্ড। তা ছাড়া বছরে একদিন ঐ ভেড়ি থেকে যার যত খুশী মাছ ধরে বিক্রি করতে পারে।

আজকাল নাটক-নভেলে, সিনেমা-থিয়েটারে ফরেস্ট অফিসের বড় বাবু কিংবা থানার দারোগাকে ঘুষখোর, বদমাস, অত্যাচারী এমনকি রক্তপায়ী দানব হিসেবে দেখানোই নিয়ম। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এখানকার ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জার বাবুটি অতি নিরীহ,

সাদাসিধে, ভালো মানুষ? জয়নন্দন ঘোষাল মানুষটি সত্যিই তাই। দারোগার কথায় আমরা পরে আসছি।

জয়নন্দন ঘোষালের দোহারা চেহারা, মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, চোখের মণি দুটি বেড়ালের মতন। এই ধরনের মানুষ সচরাচর খুব ধূর্ত হয়ে থাকে, কিন্তু ইনি বরং একটু বেশী সরল, আড়ালে অন্যরা যাকে বোকা বলে। কণ্ঠস্বর নরম ও শান্ত। জয়নন্দন ঘোষালের এক মামা তাঁকে এই বন বিভাগের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। এই রকম মানুষের পক্ষে যে-কোনো চাকরিই সমান। বিয়ে করেছিলেন যথা সময়ে। উত্তর বাংলায় যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী এক চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে নষ্ট হয়। অতি দুর্ধর্ষ ছিল সেই চা বাগানের ম্যানেজারটি, গুলি করে মানুষ খুন করে ফেলা তার পক্ষে কিছুই নয়। বউ গৃহত্যাগ করার পর জয়নন্দন সম্পূর্ণ নারীবিমুখ হয়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন। দুবেলা পুজোআচ্চা করেন। সেই জন্য এই নদী-জঙ্গলের মধ্যে নির্জন বাস তাঁর ভালোই লাগে। টাকা পয়সার দিকে তাঁর লোভ নেই, তাঁর নিচের কর্মচারীরা ঘুষ ঘাস নেয় নিশ্চয়ই, সেদিকে তিনি নজর দেন না, কারণ দিলেও কোন লাভ হয় না। সরকারী অফিসে সহকর্মীদের কে কবে দমন করতে পেরেছে।

জয়নন্দন ঘোষাল খবর পাঠালেন যে তিনি নিজেই সার্চ পার্টি নিয়ে যাবেন তিন নম্বর ব্লকে। মাধব মাঝির দল তাঁর সঙ্গেই চলুক। সজনেখালির ফরেস্ট অফিস বড় অফিস, তাদের লঞ্চ আছে, কিন্তু জয়নন্দন ঘোষালের অধীনে কোনো লঞ্চ নেই। তাঁকে যেতে হবে নৌকোয়।

পাশাপাশি দুটো নৌকা চললো।

মাধবের শরীরে একটা অস্থির ভাব। জয়নন্দন ঘোষালের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারে না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। অন্তরে তার একটা চিন্তা পোকার মতন কুরে কুরে খাচ্ছে। তিন নম্বর ব্লকে

তো হাজার খোঁজাখুজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যাবে না। ঐ খানে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা? সে নিজে গুণিন হয়ে এমন ফেরেববাজি করবে? ফরেস্টবাবু সঙ্গে যেতে চেয়েই তো যত গোলমাল বাধালেন। নইলে সে ঠিক করেছিল, আর কেউ না যাক, সে নিজেই অন্তত আর একবার সাত নম্বরে গিয়ে মনোরঞ্জনের লাশের খোঁজ করবে। চুপি চুপি সেখানে উড়িয়ে দিয়ে আসবে আর একটা পতাকা। কিন্তু ফরেস্টবাবুর নৌকো সঙ্গে থাকলে সে যায় কী করে?

একবার চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করেছিল, ও সাধু, ফরেস্টের বড় বাবুরে খুইলে কবি নাকি সব সইত্যি কথা? এ বাবু লোক ভালে।—

সাধুচরণ উত্তর দিয়েছিল, তোমার মাথা খারাপ হইয়েছে, মাধবদা? তা হলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে না? আমরাও বিপদে পড়বো, আর মনোরঞ্জনের বাপ কোনো ক্ষতি-পূরণ পাবে?

—যা হবার তা তো হইয়েই গিয়েছে.. এখন যদি সব বুঝায়ে বলি...ইনি লোক ভালো, নিশ্চয় সব বোঝবেন।

— চুপ করো, একদম চেপে যাও, মাধবদা! যতই ভালো লোক হোন, তোমার কথায় কি ইনি মিথ্যে রিপোর্ট লিখবেন? সাত নম্বরে লাশ পাওয়া গেলে ইনি লিখবেন তিন নম্বরে? খবর্দার একেবারে মুখ খুলো না। দ্যাখো নি, সাহেবের অন্য পেয়াদারা আমাদের দিকে কেমন টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়।

এ কথা ঠিক, জয়নন্দন ঘোষালের নিচের লোকেরা কেউই মাধবদের কথা বিশ্বাস করে নি। তিন নম্বর ব্লকে বাঘ, মামদোবাজি? তারা সব জানে। ঘোষালবাবু যদি সঙ্গে না আসতেন, তা হলে তারা এই লোকগুলোকে একেবারে চুষে নিঙড়ে নিতো। ঘোষালবাবু বোকা সোকা লোক বলেই রিপোর্ট নিতে চলেছেন তিন নম্বরে সত্যি বাঘ এসেছে কিনা। যদি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়, ও জায়গাটাকে নোটিফায়েড এরিয়া বলে ঘোষণা করতে হবে, কাঠ কাটার নৌকো

আর ওদিকে যেতে পারবে না। গভর্নমেন্টকেও খবরটা জানাতে হবে।

জয়নন্দন ঘোষালকে খাতির করবার জন্য সাধুচরণ দুপুরবেলা বললো, সার, আমরা পার্শে মাছের তরকারি রেঁধেছি, একটু চেখে খ্যাখবেন নাকি আমাদের রান্না ?

জয়নন্দন পাশের নৌকো থেকে বললেন, আমি তো বাবা মাছ-মাংস খাই না। আমি নিরামিষ খাই।

ফরেস্ট অফিসার নিরামিষ খান শুনে সাধুচরণরা সকলে থ হয়ে যায়। শোনা যায়, আগের বড়বাবুর মাংসের লোভ এত বেশি ছিল যে তিনি নিজে হরিণ মারতেন। এত বড় বে আইনী কাজটা অন্য যে-কেউ করলে শাস্তি দেবার ভারও ছিল তাঁরই হাতে।

জয়নন্দন জিজ্ঞেস করলেন, আর কী রেঁধেছো, তোমরা ?

আর বিশেষ কিছু বলার মতন নয়। ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ মাখা আর পার্শে মাছের ঝাল। আসবার পথে কয়েক খেপ জাল ফেলে কিছু এই ছোট পার্শে পাওয়া গেছে।

—আলু সেদ্ধ কি পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে মেখেছো ? তবে তাই দাও এক দলা, দেখি কেমন মেখেছো !

ও নৌকো থেকে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড এদের দিকে কটমটিয়ে তাকায়। বড় বাবু মাছ খান না কিন্তু তারা তো খায় ? তাদের একবার অনুরোধ করা হলো না পর্যন্ত !

ভাটার সময় দুটো নৌকো পাড়ের কাছে থেমে থাকে পাশাপাশি। কয়েকটা শামুক-খোল পাখি উড়ে গেল খুব কাছ দিয়ে। গুলতিটা সঙ্গে আনলেও বার করতে সাহস পেল না নিরাপদ। নিরামিষভোজী বড়বাবুর সামনে পাখি-শিকারও নিশ্চয়ই দোষের হবে।

সময় কাটাতে হবে তো, তাই নিরাপদ একটা গান ধরলো আপন মনে।

অগো সুন্দরী
তুমি কার কথায় করেছো মন-ভারী।
অগো সুন্দরী
যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারই
অগো সুন্দরী...

হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে অপ্রস্তুতের মতন চুপ করে গেল নিরাপদ। তার সঙ্গীরা তার দিকে বিস্ফারিত চোখে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। ইস সে এমন ভুল করলো?

এই গানটা মনোরঞ্জন গেয়েছিল যাবার দিনে। বোধহয় নদীর বুকে ঠিক এই রকমই জায়গায়। মাঝ নদীতে খোলা হাওয়ায় গলা ফাটিয়ে গান গাওয়ার স্বভাব ছিল মনোরঞ্জনের।

গানটা এত ভালো লেগেছিল যে ওরা সবাই বার বার গাইতে বলেছিল মনোরঞ্জনকে। শুনে শুনে নিরাপদর মুখস্ত হয়ে গেছে, তবু এটা মনোরঞ্জনের গান, এ গান এখন আর অন্য কেউ গাইতে পারে না। নিরাপদ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলেই—

পাশের নৌকে থেকে জয়নন্দন বললেন, থামলে কেন, গাও না। বেশ তো গলাটি তোমার। ঠাকুর দেবতার গান জানো না?

নিরাপদকে আবার গাইতে হলো। এবার তার গলার আওয়াজ বদলে গেছে, বিষণ্ণ আর গম্ভীর।

হরি হরায়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায়ে নমো
যাদবায়ে মাধবায়ে কেশবায়ে নমো
এক বার বল রে...
গোপাল গোবিন্দ নাম, একবার বলরে..

বাঃ বেশ? আর একটা?

একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিল নিরাপদ।

দেশ জননী গো তোমার চরণে
এনেছি রক্ত ডালি...

'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে যাত্রার গান, সবটা নিরাপদর মনে নেই। তাছাড়া এমন করুণ রসের গান যে গাইতে গাইতে গলা ধরে এলো তার। শুধু নিরাপদ নয়, এখন এ নৌকোর সকলেরই খুব মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা। সকলেই বিড়ি টানছে ঘন ঘন, কেউ কারো মুখের দিকে চায় না।

তিন নম্বর ব্লক যখন মাত্র আর দু বাঁক দূরে, সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলো ঝিরিঝিরি করে।

তক্ষুণি নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো মাধব আর তার সঙ্গীদের। বৃষ্টি মানেই আনন্দ। বৃষ্টি মানে চাষের শুরু। বৃষ্টি মানে নতুন ভাবে বাঁচবার আশা। অবশ্য, এই বৃষ্টিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, এদিকটা সমুদ্রের অনেক কাছে, এদিকে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। এখানে বৃষ্টি হলেই যে তাদের গ্রামেও বৃষ্টি হবে তার কোনো মানে নেই। তবু তো বৃষ্টি। আঃ, কতদিন বৃষ্টি ভেজা হয়নি।

এই বৃষ্টিতে আরও বেশী খুশীর কারণ আছে। এরপর আর তিন নম্বর ব্লকে বাঘের পায়ের ছাপের প্রমাণ দেখাবার কোনো দরকার হবে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে না? এখন মাধবদের মুখের কথাই যথেষ্ট।

সামনের ট্যাকেই তিন নম্বর ব্লক। এখানে একেবারে ঝড়-মেশানো তুমুল বৃষ্টি। জয়নন্দন ঘোষালের ছাতা উড়ে যাবার মতন অবস্থা। ঝড় বৃষ্টির সময় দূরের বনরাজি-নীলা বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু তা দেখবার মতন মন এখন কারুর নেই। ওরাও নৌকো ভেড়ালো, বৃষ্টিও থামলো অমনিই।

—এই ছ্যাখেন বড়বাবু, এই যে মা বনবিবির থান। এখানে মনোরঞ্জন পূজা দিছিল। সে মানত কইর‍্যা আইছিল তো!

জয়নন্দন ঘোষাল ভক্তি ভরে গড় করলেন, তাঁর দেখাদেখি অন্য সকলেও। সাধুচরণের মনে একটু অভিমান হলো মা বনবিবির প্রতি। মনোরঞ্জন তো সত্যিই পুজো দিয়েছিল, তবু মা তাকে রক্ষা করলেন না!

—তারপর এই যে, এই গাছে আমরা পেরথমে কোপ দিছি। অ্যাখোনো দাগটা রইছে।

জয়নন্দন বললেন, তুমি তো বাপু গুণিন। তুমি আগে মন্ত্র পড়ে এই জঙ্গল আটক করে রাখো তো! কী জানি বাপু, কখন কী হয় বলা যায় না!

যে বনে বাঘ নেই জানা কথা, সেখানে মন্ত্র পড়ায় গুণিনের আর কী কৃতিত্ব। তবু মন্ত্র পড়তে হয় মাধবকে। শেষের দিকে সে চ্যাঁচাতে শুরু করলে অন্যরাও যোগ দেয় সেই চিৎকারে। বন্দুকধারী গার্ডটি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে। সে জানে, সোঁদরবনের বাঘ বড় টেঁটিয়া, লোকজনের গলার আওয়াজ শুনলে আরও কাছে আসে। এতো আর তরাই জঙ্গলের বাঘ নয় যে একের বেশী দুজন মানুষ দেখলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে।

—তারপর কোন দিকে গিস্‌লে তোমরা?

মাধব এবার সাধুচরণের দিকে তাকায়। ঠিক সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বর্ণনাটি দেবার ভার তার ওপর।

সে শুরু করলো, এই যে বড়বাবু, এই বাইন গাছটার মাথায় কাঁকটা বইসেছিল। নিরাপদ চেষ্টা করে মারতে পারলো না। তারপর আমরা সবাই লাইন করে...।

যে-বনে বাঘ নেই, সে বনে এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো বাঘের চিহ্ন! যে বনে মনোরঞ্জন বাঘের মুখে পড়ে নি, সেই বনে খোঁজা হলো তার লাশ। মনোরঞ্জন খালি গায়ে নেমেছিল জঙ্গলে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন গার্ড একটা ঝোপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলো তার গেঞ্জি। তাতে আবার ছিটে ছিটে রক্ত মাখা। মাধবরা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দিল ঐ যে গেঞ্জি মনোরঞ্জনেরই। নিরাপদ ঐ ছেঁড়া গেঞ্জিটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু লুঙ্গি আনতে পারে নি প্রাণে ধরে।

জয়নন্দন ঘোষাল তাতেই সন্তুষ্ট! কিন্তু বাঘ যে আবার তিন

নম্বর ছেড়ে চ'লে গেছে, তাও তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যদিও এত হাঁক ডাকেও বাঘের কোনো সাড়া নেই। সমুদ্রের মতন এতবড় চওড়া নদী, বাঘ তাও সাঁতরে যায়-আসে। কুমীর-কামটেরও ভয় নেই বাঘের। জানোয়ারের মতন জানোয়ার বটে!

ফেরার পথে ছুটো নৌকো আলাদা হয়ে গেল।

মাধব বললো, আইলামই যখন, তখন তুই এক বোঝা কাঠ কাইট্যা লইয়া যাই, কী কস তোবা?

নিরাপদ সাধুচরণরা একটু কিন্তু কিন্তু করে। মহাদেব মিস্তিরি বিনা পয়সায় এই নৌকো দিয়েছে আসা যাওয়ার বাঁধা সময়ের কড়ারে। দেরি হলে সে ধরে ফেলবে।

মাধব বললো, সবাই মিলে ঝপাঝপ হাত লাগালেই তো চাইর পাঁচ বোঝা কাঠ হয়। বোঝোস না তোরা, ফিরা গিয়া খামু কী?

—কিন্তু কাঠ নিয়ে গেলেই তো ধরে ফেলবে।

—সে চিন্তা নাই। যাওনের পথে ছুটো মোল্লাখালিতে নৌকো ভিড়ায়ে কাঠগুলো দাউদ শ্যাখের গুদামে ফেলাইয়া গ্যালেই হবে!

থাঁড়ি দিয়ে খানিকটা ঢুকে ওরা কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়। বুদ্ধি করে ছুখানা কুড়ুল এনেছে মাধব। বাইন-গরান-হেঁতাল যা সামনে পায় তাতেই ঝপাঝপ কোপ লাগায়। জ্বালানী কাঠ তো জ্বালানীই সই। যা পাওয়া যায়।

বাঘ নেই, তবু বাঘের ভ' ' গা ছমছম করে নিরাপদর। সব সময় মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা। নিরাপদই প্রথম জঙ্গলে আসার প্রস্তাব তুলেছিল। মনোরঞ্জন ভূত হয়ে কাছাকাছি ঘুরছে না তো? কেন মরতে এসেছিলি মনোরঞ্জন, তোকে তো কেউ ডাকে নি?

পরদিন ওরা গাঁয়ে ফিরলো সন্ধে-সন্ধি। ছোট মোল্লাখালিতে

কাঠ নামিয়ে দু-চার'টে টাকা যা পেয়েছে, তা দিয়ে অনেক দিন পর ওরা ধুম মাতাল হলো। সাঁওতাল পাড়ায় দু টাকায় এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, তাই তিন-চার হাঁড়ি টেনে ওরা গড়াগড়ি দিতে লাগলো নিশুতি অন্ধকারের মধ্যে হাটখোলায়।

নিরাপদ ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো, ওরে মনোরঞ্জন তুই কোথায় গেলি? তুই ছাড়া কে হীরো হবে আমাদের যাত্রায়? ওরে, তোকে আমি একবার ক্যানিং-এর খানকি পাড়ায় নিয়ে গেসলাম, কত আনন্দ হলো সেবার! ওরে মনা, মনা রে—।

অরুণাংশুর মনোবেদনা

জ্বরের ঘোরে দু-দিন প্রায় বেহুঁশ হয়ে রইলেন পরিমল মাস্টার। যে-হেতু এদিকে গোসাবা ছাড়া আর কোথাও ডাক্তার নেই, তাই সুলেখা নিজেই হাফ-ডাক্তার। গ্রামের লোকদের টুকিটাকি অসুখে তিনি নিজেই ওষুধ দেন, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক দুরকমই।

পরিমলের এতখানি অসুখ হওয়ায় সুলেখার জ্বরটা যেন আপনা থেকেই বিনীত ভাবে সরে গেল। প্রথম রাতে স্বামীকে নিজেই ওষুধ দিলেন। পরদিন বেলাবেলি এলেন ডাক্তার। তাঁর সন্দেহ, পারমল মাস্টারের টাইফয়েড হয়েছে। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অসুখ হয়েছে বলেই যে হুট করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে এমন মনে করেন না সুলেখা। তাঁর মাথা ঠাণ্ডা, তাঁর বাইরের চাঞ্চল্য কদাচিৎ দেখা যায়। এই যদি সুলেখার এরকম অসুখ হতো তা হলে পরিমল খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ছেলে-মেয়ের অসুখ হলে সেই ব্যস্ততা আরও চারগুণ হয়।

মাঝে মাঝে চোখ মেলে পরিমল আচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞেস করেন, তারপর কী হলো নাজনেখালিতে? ছেলেটার নাম যেন কী? কোন্ বাড়ির ছেলে?

সুলেখা জানেন, এই সময় পুরো কাহিনীটি তাঁর স্বামীকে জানানো বৃথা। জ্বরতপ্ত মাথায় কোনো চিন্তা দানা-বাঁধে না। তিনি সংক্ষেপে দু-চারটে কথা বলেন, তার মধ্যেই আবার ঝিমুনি এসে যায় পরিমলের।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে পরিমল একবার জিজ্ঞেস করলেন, অরুণাংশু এসেছে?

সুলেখা বললেন, এই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অরুণাংশুবাবুর আসবার দরকার কী?

—একটা লঞ্চের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন?

—ওটা পুলিশের লঞ্চ। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো তো।

—না, ছাখো, হয়তো ঐ লঞ্চেই অরুণাংশু আসছে? ও সব পারে।

—এলে আর কি হবে। থাকবে। তবে তোমার বন্ধু যদি এবার এসে এখানে মদ খায় এবং হল্লা করে, তা হলে স্পষ্ট দু কথা শুনিয়ে দেবো।

—অ্যাঁ? কী বলছো?

অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মাথায় হাত রেখে সুলেখা নরম গলায় বললেন, আর একবার জলপট্টি লাগাবো? ঘুম ভেঙ্গে গেল কেন হঠাৎ?

—একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

খানিকটা বাদে পরিমল আবার বলে উঠলেন, বুঝলে না এটা ওদের নেশা···ওরা যাবেই।

—কাদের কথা বলছো?

—ঐ যে ওরা। যতই তুমি নিরাপত্তা দাও, পেটে খাবার দাও, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়া মানুষের ধর্ম, সেই জন্য ইচ্ছে করে ওরা বাঘের মুখে যায়...

—ওসব কথা এখন তোমায় ভাবতে হবে না।

—কেন ভাববো না? আমিও ওদের সঙ্গী, বুঝলে সুলেখা, মনে মনে আমিও ওদের সঙ্গে জঙ্গলে যাই।

—তুমি এখন একটু ঘুমোও, প্লীজ।

—যারা বাঘের পেটে যায়···তারা সবাই আমার খুব চেনা···আমার ছোট ভাইয়ের মতন···

ঘুমের ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সুলেখা

নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন পরিমলের পাতলা হয়ে আসা চুলের মধ্যে। আপন মনে কিছুক্ষণ কথা বলে থেমে গেলেন পরিমল।

পরদিনও জ্বর রইলো এক শো পাঁচ।

প্রলাপ বকার মতন মাঝে মাঝে কথা বলে যেতে লাগলেন স্ত্রীর সঙ্গে, দু-একবার শোনা গেল অরুণাংশুর নাম। কিন্তু অরুণাংশু আসেও নি। আর কোন খবরও দেয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন যে পরিমলের রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া যায় নি, জ্বর রেমিশানের জন্য তিনি পাল্টে দিলেন ওষুধের নাম। সে ওষুধ অবশ্য গোসাবায় এখন পাওয়া যাচ্ছে না। বনমাতা লঞ্চের সারেং-কে অনুরোধ করা হলো, ক্যানিং থেকে প্রথম ফেরার লঞ্চের সারেং-এর হাতে যেন ঐ ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাসনাকে মহিলা সমিতির হোস্টেলে এনে রেখেছেন সুলেখা। এই দু দিন তার প্রতি তিনি বিশেষ কোন মনোযোগ দিতে পারেন নি। ওখানে অন্য মেয়েরা আছে, তারা দেখবে। তাছাড়া এখন এ মেয়েটির কান্নারই সময়, একা নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদুক।

তৃতীয় দিনে শুরু হলো অন্য রকম উৎপাত।

মামুদপুর থেকে বাসনার বাবা এবং কাকা এসে হাজির। প্রথমে তারা গিয়েছিল নাজনেখালিতে, সেখানে মেয়ের শাশুড়ির কাছ থেকে গাল মন্দ খেয়ে অপমানিত হয়ে তারা দাপাদাপি করতে লাগলো জয়মণিপুরে এসে।

মহিলা সমিতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা গালাগালির ভাণ্ডার উজাড় করে দিল। বাসনার বাবার চেয়ে তার কাকারই গলার জোর বেশী। কাকার নাম নিতাইচাঁদ, মুখে মোল্লাদের মতন দাড়ি, লুঙ্গির ওপর নীল ছিটের জামা পরেছে, বাঁ হাতে একটা রূপোর তাগা বাঁধা। তার তুলনায় ধুতি ও গেঞ্জি পরা বাসনার বাবা শ্রীনাথ অনেকটা নিরীহ।

নিতাইচাঁদ আর শ্রীনাথ কিন্তু পৃথক অন্ন, কিন্তু এই শোকের সময় তারা এক হয়ে গেছে।

তাদের গালাগালির মূল বক্তব্য, তাদের মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঠেলে এখানে পাঠানো হয়েছে? তাদের মেয়ে কি অনাথ? এখনো মামুদপুরে নিতাইচাঁদ সাধুকে সবাই এক ডাকে চেনে। কী কুক্ষণেই না তারা এক হারামজাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের।

সেই গালাগাল শোনবার জন্য এখানেও একটা ভিড় জমেছে। শোকের ব্যাপার বলেই অন্য সবাই চুপ করে আছে, নইলে তারাও নানা রকম মন্তব্য করতে ছাড়তো না। শোকেদুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কত কী বলে, সে সব কথা ধরতে নেই।

শুধু বদন দাস একবার বললো, ও দাদারা, একটু আস্তে কথা বলুন! মাস্টার মশাইয়ের খুব অসুখ।

সে কথা ওরা কানেই তুললো না।

ঐ চ্যাঁচামেচি অসহ্য লাগছে সুলেখার। স্বামীর শোওয়ার ঘরটার জানলা-দরজা সব বন্ধ করে রেখেছেন যাতে তাঁর কানে কিছু না যায়। তবু পরিমলমাস্টার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন ও কিসের গোলমাল? আজ এখানে গ্রাম-সভা বুঝি?

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না সুলেখা। তিনি ওদের সামনে এসে বললেন, আপনারা এখানে এত চ্যাঁচামেচি করছেন কেন? আপনাদের মেয়েকে কি জোর করে এনেছি? আপনাদের ইচ্ছে হলে তাকে নিয়ে চলে যান।

এবার নিতাইচাঁদ আরও জোরে বললো, কোন্ সাহসে ওরা বলে যে আমাদের মেয়ে অলক্ষ্মী? ভাতারখাগী? ছোটলোকের বাড়ি তো, জানে না আমরা কত বড় বংশ, আমাদের মেয়ে কোনদিন মুখ তুলে কারোর সঙ্গে কথাটি বলে না···

সুলেখা ক্লান্ত ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এসব কথা তাঁর কাছে বলার কী মানে হয়? মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা না থাকলে তিনি

ওদের ধীরে সুস্থে বুঝোবার চেষ্টা করতেন। এখন ভালো লাগছে না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, চ্যাঁচামেচি করতে বারণ করলুম না? আপনাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে চান কিনা বলুন?

নিতাইচাঁদ বললো, চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে? আমরা আপনার খাই না পরি? না আপনাদের কো-অপের ধার ধারি? আমাদের মামুদপুরেও কো-অপ আছে। এখানে প্রোজেক্টের টাকা কী ভাবে খরচা হয়, তা সবাই জানে...।

পরিমল মাস্টার থাকলে তিনি ওদের দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে দূরে নিয়ে যেতেন, রঙ্গ রসিকতা করতেন, গাছতলায় বসে ওদের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে টানতেন। খানিক পরেই ওরা প্রতি কথায় ঘাড় হেলিয়ে বলতো, হ্যাঁ মাস্টারমশাই, হ্যাঁ মাস্টারমশাই।

সুলেখা চলে গেলেন মহিলা সমিতির হোস্টেলের ভেতরে। হোস্টেল মানে তিন খানা চ্যাঁচা বেড়া দেওয়া ঘর, মেয়েরা চোখ গোল গোল করে শুনছে, তাদের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে বাসনা।

সুলেখা বাসনার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চলে যেতে চাও, না থাকতে চাও•

বাসনা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আবার কাঁদতে শুরু করলো।

সুলেখা কড়া গলায় বললেন, এখন কান্না থামাও। কাঁদা কাটা করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন থেকে তোমার ভালো মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে।

বাসনা তবু কোন কথা বলে না। ফোঁপায় শুধু।

—আমার মনে হয়, এখন তোমা‹ বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। এই ননী, বিমলা, ওর জিনিসগুলো গুছিয়ে দে।

দুপুর প্রায় একটা। নারী সমিতির মেয়েরা বাসনাকে না খাইয়ে এ সময় যেতে দেবে না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ একটু দূরে একটা খিরিশ গাছের তলায় বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে লাগলো। খাওয়া জুটলো না ওদের। এ গ্রামে তো হোটেল নেই। আর

ওরকম ঝগড়ুটে দুজন লোককে কোন্ গৃহস্থ নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে?

নদীর বুকে প্রথমে জেগে উঠলো ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ, তারপর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে হর্ন। আড়াইটের লঞ্চ। বাসনাকে সামনে রেখে শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ এগিয়ে গেল লঞ্চ ঘাটার দিকে।

পরিমল মাস্টার এসব কিছুই জানলেন না।

সেই মেঘমালা লঞ্চ থেকেই নামলেন বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্ত। তিনি সদ্য বিধবা বাসনাকে লক্ষ্য করলেন না। এখানে আট-দশজন যাত্রী ওঠে নামে, কে কার দিকে তাকায়। তা ছাড়া এই জয়মণিপুর থেকে ওঠে ঘি-দুধের ড্রাম। হৈ হৈ, ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি। বরং অরুণাংশুর দিকেই অনেকে আড়চোখে তাকালো। তিনি যে বিখ্যাত তা অবশ্য কেউ জানে না, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে এক পলক তাকালেই বোঝা যায় তিনি এখানকার মানুষ নন, শহরের গন্ধ মাখা প্রাণী।

গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার্স, ফুল ফুল ছাপা খাদির হাওয়াই শার্ট, মাথার চুল কাঁচা পাকা, দু চোখের কোণে অনিদ্রার কালি, মুখে অসংযম ও অত্যাচারের ছাপ। লেখক হিসাবে অরুণাংশু রবি ঠাকুরের বংশধর নন। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো ব্যাপারে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

অরুণাংশু সাধারণত একা বাইরে যান না, সঙ্গে দু-একজন বন্ধু-বান্ধব থাকে, যে কোনো জায়গায় যাত্রাপথেই তিনি মদ্যপান করতে করতে শুরু করেন, অল্প অল্প নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি জোরে জোরে হাসেন, হুকুম করা সুরে কথা বলেন, সব জায়গায় তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে দেন সকলকে। যাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, তারাই সর্বক্ষণ সরবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ শিল্পী-লেখকই ভোগেন এই রোগে।

আজ কিন্তু অরুণাংশুর একেবারে অন্যরকম রূপ। তিনি এসেছেন

একা, যত দূর সম্ভব দেখে মনে হয় নেশা করেন নি, মুখে গাঢ় বিমর্ষতা মাখানো। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঝুলছে। আগে একবার এখানে এলেও তিনি দিক ভুলে গেছেন, লঞ্চ থেকে নেমে তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। জোয়ারের সময়, তাই পায়ে কাদা লাগে নি।

বদন দাসকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা কোথায়?

বদন দাস বললো, আসেন আমার সঙ্গে।

এই লঞ্চে যারা কলকাতা থেকে আসে, তারা খেয়েই আসে সাধারণত। খবর না দিয়ে এলে আড়াইটে-তিনটের সময় কে ভাত রান্না করে দেবে? অধিকাংশ গ্রামের মানুষই বেলা এগারোটার মধ্যে ভাত-টাত খাওয়া সেরে ফেলে। অরুণাংশু খেয়ে আসেন নি, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হবার পর তিনি তা বললেন না। বন্ধুর অসুখ শুনে তিনি গিয়ে বসলেন তার খাটের পাশে।

ওষুধ ও জ্বরের ঘোরে পরিমল মাস্টার অজ্ঞানের মতন ঘুমোচ্ছেন। এই যদি অন্য সময় হতো, অরুণাংশুর মাথায় টলটলে নেশা থাকতো, তাহলে তিনি এই রকম কোনো ঘুমন্ত বন্ধুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলতেন, এই শালা, ওঠ। জ্বর-ফর আবার কী রে, লোকের এত জ্বর হয় কেন, আমার তো কোনো দিন হয় না।

আজ অরুণাংশু তাঁর বন্ধুর পাশে বসে আলতো করে একটা হাত রাখলেন কপালে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সুলেখা, তোমাদের এখানে আমায় একটা চাকরি দিতে পারবে? আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।

এমন কি রসিকতা মনে করে হাসলেনও না সুলেখা। সঙ্গে সঙ্গে দু-দিকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবেন তো?

—এখন না। আমিও একটু ঘুমোবো? কোথায় ঘুমোবো বলো তো?

ছেলে আর মেয়ের পড়ার ঘরটা এখন ফাঁকাই পড়ে আছে। খাটও আছে একটা, সেখানেই শোওয়ার ব্যবস্থা হলো অরুণাংশুর। কিন্তু শুয়েও ঘুমোলেন না তিনি। চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন একটার পর একটা। সেই বিমর্ষ ভাবটা মুখে লেগেই রইলো।

কদিন ধরে স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রী তুজনেই না গেলে বেশ অসুবিধে হয়। তাই বিকেলের দিকে সুলেখা একবার স্কুলে ঘুরে আসতে গেলেন। কাছেই তো।

সন্ধের পরও অরুণাংশুর ঝোলা থেকে মদের বোতল বেরুলো না। পরিমল জেগে ওঠার পর তাঁর খাটের ওপর গিয়ে বসে তিনি চা খেলেন।

পরিমল প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, কিসে এসেছিস, পুলিসের লঞ্চে?

—না তো!

—রাত্তিরে পুলিসের লঞ্চের শব্দ পেলাম।...

সময়ের হিসেবটা গুলিয়ে গেছে পরিমলের। তুপুরের লম্বা ঘুমের পর জেগে উঠে যেমন অনেক সময় মনে হয় সকাল।

—আর কে কে এসেছে?

—কেউ না!

—মনোরঞ্জন বলে একটা ছেলের আসবার কথা ছিল না? নাজনেখালির মনোরঞ্জন। সে তোর সঙ্গে আসে নি?

সুলেখা বললেন তুমি কী বলছো? নাজনেখালির মনোরঞ্জনকে উনি চিনবেন কেন? আর সে এখানে আসবেই বা কী করে? তাকে তো বাঘ নিয়ে গেছে!

এই প্রথম উঠলো বাঘের কথা।

পরিমল মাস্টার ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, হ্যাঁ, তারপর কী হলো বলো তো? ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই যে তুমি নাজনেখালি গেলে…বিষ্টুপদর ছেলে না মনোরঞ্জন? তাকে সত্যিই বাঘে নিয়ে গেছে?

সুলেখা বললেন, হ্যাঁ। তার বউয়ের বয়েস মাত্র উনিশ-কুড়ি। এই তো মোটে ক-মাস আগে বিয়ে হয়েছে।

এর পর সুলেখা অতি সংক্ষেপে বাসনা নাম্নী মেয়েটির এই কয়েকদিনের জীবন-কাহিনী শোনালেন।

মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে পরিমল মাস্টারের। তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন ঘটনা পরম্পরা।

তিনি বললেন, মেয়েটা চলে গেল? তুমি তাকে যেতে দিলে?

—বাঃ, তার বাবা কাকা নিতে এসেছে আমি তাকে আটকে রাখবো নাকি?

—ছাখো না এবার কি রকম মজা হয়।

তিনি হেসে উঠলেন হো-হো করে। সুলেখা অবাক। এমন অসুস্থ লোকের মুখে তৃপ্তির হাসি?

—তুমি হাসছো?

—বললাম তো, ছাখোই না এবার কী মজা হবে।

অরুণাংশু আগাগোড়া চুপ। কোনো কিছুতেই তিনি উৎসাহ পাচ্ছেন না। সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের মেঝেতে ফেলাই তাঁর চরিত্র-ধর্ম, আজ কিন্তু তিনি মনে করে করে প্রত্যেকবার জানলার বাইরে ফেলে আসছেন।

প্রসঙ্গ বদলে পরিমল বললেন, আমি এমন কাবু হয়ে পড়লাম, তোকে নিয়ে কোথাও ঘোরাঘুরি করতে পারবো না।

অরুণাংশু বললেন, আমি এখানে কয়েকটা দিন চুপচাপ শুয়ে থাকবার জন্য এসেছি।

—কিছু লেখবার জন্য?

—না। লেখা-টেখার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।

—মানে?

—আমি লেখা ছেড়ে দেবো। দেবো মানে কি, ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে আর লিখে!

—চারদিকে তোর লেখার জয় জয়কার···কাগজ খুললেই তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন।

—দূর দূর, ও সব বাজে!

—তুই দু-চারখানা বই আনিস নি আমাদের জন্য?

—নাঃ!

সুলেখা ভাবলেন, ও, অকাল বৈরাগ্য? সেই জন্যই মুখখানা শুকনো শুকনো, উদাস উদাস ভাব? তা ভালোই হয়েছে, এই জন্য যদি কয়েকদিন অন্তত মদ খাওয়া বন্ধ থাকে···অন্তত এখানে তো ওসব কিছু চলবেই না।

পরিমল বললেন, না রে, অরুণাংশু তোকে সীরিয়াসলি বলছি তুই এখানকার মানুষজনদের নিয়ে লেখ্ না! তোর কলমের জোর আছে, তুই কিছুদিন এখানে থেকে ছাখ সব কিছু···

—না, না, না! আমি বুঝে গেছি লিখে এই পৃথিবীর কোনো কিছু বদলানো যায় না। সাহিত্য-টাহিত্য সব বিলাসিতা।

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল পরিমলের। শরীর খুব দুর্বল, হাঁটতে গেলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু তিনি যেন অনুভব করলেন এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই জ্বর ঝেঁকে ঝেঁকে আসে। এবার কড়া ওষুধের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

অরুণাংশু সত্যিই প্রায় সারা দিন শুয়েই কাটালেন। একটা বই পর্যন্ত পড়েন না।

পরিমল বললেন, তুই গ্রামের মধ্যে একলা-একলাই একটু ঘুরে আয় না। তোকে তো এখানে বিখ্যাত লোক বলে কেউ খাতির করবে না, নিজের চোখে এদের অবস্থা দেখবি।

—নাঃ, ভালো লাগছে না।

—গতবারে তো সজনেখালি যাওয়া হল না। এবার যাবি? ব্যবস্থা করে দিতে পারি। একজন কারুকে সঙ্গে দেবো, তোকে নিয়ে যাবে···ইচ্ছে করলে ওখানে একটা রাতও কাটিয়ে আসতে পারিস, বাঘের দেখা না পেলেও হরিণ দেখতে পাবি অনেক—

—নাঃ, ইচ্ছে করছে না!

গ্রামের মানুষ অরুণাংশুকে না চিনলেও স্কুলের মাস্টারদের মধ্যে তাঁর ভক্ত থাকবেই। শুধু জয়মণিপুরের তিনজন শিক্ষকই নয়, খবর পেয়ে গোসাবা থেকেও দুজন শিক্ষক এলেন অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। লেখকের সামাজিক দায়িত্ব, সাহিত্যে অশ্লীলতা, বাংলা সাহিত্যে এখন আর গ্রাম নিয়ে তেমন কিছু লেখা হচ্ছে না কেন। এই সব ভালো ভালো বিষয় নিয়ে বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তের সঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু অরুণাংশু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ধানের দর কত, চাষীর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি করে, হস্টেলে কী রকম খাওয়া দেয়, হ্যামিল্টন সাহেব আসলে বুর্জোয়া জমিদার ছিল কি না···এই সব এলোমেলো প্রশ্ন। এবং একটু পরেই ঐ সব শিক্ষকদের নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে 'একটু আসছি' বলে অরুণাংশু পরিমলের খাটে গিয়ে শুয়ে রইলেন। আর এলেনই না।

মাস্টারমশাইরা খানিকক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বসে থেকে উঠে গেলেন এক সময়।

সৃষ্টিধর বেরার মিষ্টিপুকুরে খুব ভালো জিওল মাছ আছে, তার থেকে বেশ বড় বড় গোটা কতক মাগুর মাছ সে পাঠিয়ে দিল এ বাড়িতে। জ্বর থেকে উঠে মাস্টারমশাই আজ ঝোল-ভাত পথ্য করবেন সেই জন্য। সৃষ্টিধর ধানের কারবার করে, বেশ দু-পয়সা আছে, তার একজন দুর্বল প্রতিবেশীকে জোর করে জমি থেকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে পছন্দ করেন না পরিমল। গ্রামের

অন্য লোকজনদের মধ্যে একটা জনমত সৃষ্টি করেও তিনি সৃষ্টিধরকে শায়েস্তা করতে পারেন নি। অনেকেই আড়ালে গিয়ে সৃষ্টিধরের কাছে হাত পাতে। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই সৃষ্টিধরের কাছে কোন না কোনো ভাবে ঋণী।

ও মাছ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পরিমল। কিন্তু ইলা আগেই কুটে ফেলেছে।

সুলেখা বললেন, ঠিক আছে, সৃষ্টিধর বাবুকে দাম পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তবু মুখখানা গোঁজ হয়ে রইলো পরিমলের। মাগুর মাছ তাঁর খুবই প্রিয়। এরকম স্বাস্থ্যবান মাগুর আশেপাশের দশ খানা হাট খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তবু আজ এই মাছে কোনো স্বাদ পেলেন না পরিমল।

পাশাপাশি দুই বন্ধু খেতে বসেছেন। মাগুর মাছ বিষয়ে এত সব কথাবার্তার মধ্যে একটিও মন্তব্য করলেন না অরুণাংশু। একেবারে নিঃশব্দ। আহারে রুচি নেই, খেতে হয় তাই খাওয়া।

—তুই মুড়োটা খা। তুই তো মাছের মুড়ো ভালোবাসিস।

অরুণাংশু বললেন, না। আজ থাক। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অরুণাংশু থালায় আঁকিবুকি কাটছেন। অর্ধেক পাত পড়ে আছে। এমনিতে তিনি মাছ খেতে খুবই ভালোবাসেন, অথচ আজ কোনো আগ্রহই নেই।

সুলেখা স্কুলে চলে যাওয়া মাত্র পরিমল বললেন, একটা সিগারেট দে।

অরুণাংশু অন্যমনস্ক ভাবে নীল রঙের ধোঁয়ার নানা রকম প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করছেন।

—তোর কী হয়েছে, বল্ তো? গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে।

অরুণাংশু বললেন, না, সেরকম কিছু না। এমনিই মনটা ভালো নেই।

—ডিপ্রেশান ?

—তোর এরকম হয় না কখনো ?

—কোন্ রকম ? খাবার দাবারে অরুচি ?

—না। এমনিই অকারণ মন-খারাপ ?

—যারা ভাবের কারবার করে, তাদেরই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। আমি এখানে সব সময় একেবারে রূঢ় বাস্তবের মধ্যে থাকি, মানুষের নিছক খাওয়া পরা জন্ম মৃত্যু খরা বন্যা জমি ধান ঋণ খালকাটা এই সব—এই সব এলিমেন্টাল ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে কখনো কখনো রাগ হয় ক্ষোভ হয়, অস্থিরতা এমন কি হতাশাও আসতে পারে মাঝে মাঝে। কিন্তু যাকে মন খারাপ বলে তা হবার কোনো সুযোগ নেই।

পরিমল এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন কথাগুলো, কিন্তু অরুণাংশু শোনেন নি। শূন্য ভাবে চেয়ে আছেন, মন অন্য কোথাও।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

—এই জায়গাটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। পাখি টাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ট্রাম বাসের আওয়াজ আর মানুষের চ্যাঁচামেচি শুনতে হচ্ছে না, এ এক দারুণ শান্তি।

পরিমল ভুরু কুঁচকে তাকালেন বন্ধুর দিকে। লেখার সময়টুকু ছাড়া যে মানুষ সব সময় হৈ চৈ, মানুষের সঙ্গ, ফূর্তি, আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি লাগানো কথাবার্তা ছাড়া থাকতে পারে না, তার হঠাৎ এই নৈঃশব্দ্য-প্রীতি ?

অরুণাংশু বললেন, তোর এখানে আমি যদি বছরখানেক থেকে যাই ? জমি চাষ করবো, খাল কাটার জন্য কোদাল ধরবো, নৌকো নিয়ে চলে যাবো জঙ্গলে—

—ব্যাপারটা আসলে কী ? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ? সান্ত্বনাকে নিয়ে আসবি বলেছিলি যে ?

না, ব্যাপারটা মোটেই স্ত্রীঘটিত নয়। অরুণাংশু যে-রকম

জীবন যাপন করেন, তাতে প্রায়ই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হবে সে আর এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার। সান্ত্বনার সহ্য শক্তি খুবই। দু' তিনবার অবশ্য সেই সহ্য শক্তিরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সান্ত্বনা ডিভোর্সের প্রস্তাব দিয়েছে।

অরুণাংশু তখন দু' চারদিন খুব নিরীহ, ভালোমানুষ সেজে থাকেন। তখন অরুণাংশুকে দেখলে যেন চেনাই যায় না।

এবারের অবস্থাটা সে-রকম নয়।

একটি অখ্যাত ছোট পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে এককালের প্রতিভাবান বিদ্রোহী, আধুনিকতার ও যৌবনের প্রধান প্রবক্তা অরুণাংশু সেনগুপ্ত এখন এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে বাঁধা পড়ে গেছেন। পয়সার জন্য লেখেন, জনপ্রিয়তার জন্য দুধে জল মেশাচ্ছেন।

এসব সমালোচনা সাধারণত গ্রাহ্য করেন না অরুণাংশু। সাহিত্য-জীবনের প্রায় গোড়াতেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে অক্ষম লোকরাই সমালোচনা করে। কোনো একজন লোক বলে দেবে, তোমার লেখাতে এই এই দোষ, অমুক অমুক ত্রুটি, তাতেই কোনো লোক নিজেকে সংশোধন করে নেবে? এরকম কখনো হয়?

নিন্দে তিনি সহ্য করতে পারেন না একেবারে। আর নিন্দে বা কটু সমালোচনা তো হবেই। কেউ সার্থক হলেই একদল লোক তাকে ছোট করবার চেষ্টা করে। বামনদের দেশে দু-একজন যদি লম্বা হয় অমনি অনেকে তাদের টেনে হিঁচড়ে নিজেদের সমান করতে চায়। নির্লজ্জ ঈর্ষা নানা রকম রঙীণ ভাষায় পোশাক পরে সমালোচনার নামে আসরে নামে। আর সব যুগেই থাকে একদল নপুংসক ধরনের লোক, যারা নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের কোনো বর্ণনা দেখলেই সমাজ-সংস্কৃতি সব গেল গেল বলে আর্তনাদ করতে থাকে। অরুণাংশু এসব পত্র-পত্রিকা পেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেন।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একদিন

একটি যুবক একটি পত্রিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অরুণদা, এ একটু পড়বেন। অরুণাংশু আগেই জানতেন সে পত্রিকায় তাঁ সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে। ঝট্ করে পত্রিকাটি নিয়েই সেই যুবকটির মুখে চেপে ধরে বলেছিলেন, নে, খা, তোর বমি তুই নিজেই খা।

তবু কোনো এক সময় ভেতরের কোনো একটা জায়গায় হঠাৎ আঘাত লাগে। কিছু একটা ঝন্ করে বেজে ওঠে। অক্ষম ব্যর্থদের ঈর্ষার জন্য নয়, এমনিই এক এক সময় নিজের গভীরে গিয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয়। আপাত-সার্থকতার ওপর পড়ে ব্যর্থতার গোপন গভীর ছায়া। পত্রিকাটা উপলক্ষ মাত্র।

অরুণাংশু উদাসীন ভাবে বলতে লাগলেন, জীবনটা কী ভেবেছিলাম, কী হয়ে গেল। ভেবেছিলাম জীবনে কোনো বন্ধন থাকবে না অথচ...এই যে লেখালেখি, এও তো বন্ধন, বছরে দুটো তিনটে উপন্যাস লেখা...ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় লিখতে হয়... ট্রাজেডি কি জানিস, যারা এস্টাব্লিশমেণ্টের বাইরে থাকে, তাদের আসলে মনে মনে ইচ্ছে করে ওর মধ্যে ঢুকবো, কবে বড় কাগজে সুযোগ পাবো, তাদের গালাগালি হচ্ছে কংস রূপে ভজনা, আর যারা এস্টাব্লিশমেণ্টের মধ্যে ঢুকে যায়, তাদের মধ্যেও একটা অস্থির ছটফটানি থাকে, তারাও ভাবে, বন্দী হয়ে গেলুম? এর থেকে আর বেরুতে পারবো না? ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, সারাজীবন অনবরত লিখেই যেতে হবে? যে-ভাষার জন্য এত মায়া ছিল, সেই ভাষাও ক্ষয়ে যায়, ঠিক আয়ুর মতন—

—এটাই তো স্বাভাবিক।

—কী স্বাভাবিক?

—যদি আয়ুর টার্মসে ভাবিস।

—ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না, এক ধরনের কষ্ট...মনে হয় এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, সবই ব্যর্থ।

একটু একটু ঘুম এসে যাচ্ছে পরিমলের। কিন্তু তিনি ঘুমোবেন

না। জ্বরের পর ভাত-ঘুম ভালো নয়। তিনি অরুণাংশুর আত্মগ্লানির প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। অরুণাংশু এসব কথা কোনোদিনই মুখে বলে না, আজ বলছে যখন বলুক। মন থেকে বেরিয়ে যাক, সেটাই ভালো হবে।

ছেলে-মেয়েদের পড়বার ঘরের খাটে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন অরুণাংশু, তিনি বসে আছেন চেয়ারে। এর মধ্যে তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে খুবই দোনা-মোনা ভাবে। জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন, বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকছে সাধুচরণ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুচরণ ঠিক চোরের মতন মুখের ভাব করে বললো, নমস্কার মাস্টারমশাই।

অন্য চেয়ারটি ঠেলে দিয়ে পরিমল গম্ভীর গলায় বললেন, বসো।

বসলো না, চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে দাঁড়িয়েই রইলো সাধুচরণ। কথার মাঝখানে অন্য একটি লোক এসে পড়ায় অরুণাংশু বিরক্ত হয়েছেন।

পরিমল বললেন এর নাম সাধুচরণ পাণ্ডা। এর স্বাস্থ্যটি দেখেছিস?

অরুণাংশু বললেন, এদিককার লোকের স্বাস্থ্য তেমন খারাপ নয়। আমি পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখেছি গ্রামের মানুষ সবাই যেন রোগাটে ক্ষয়াটে চেহারা…।

—সত্যেন দত্ত যে বাঙ্গালীদের কথা লিখেছেন, এখানকার লোকেদের সম্পর্কেই তা বেশী করে খাটে। এদের সত্যিই বাঘ কুমীর আর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়।

—কুমীর কোথায় এখন? কুমীর আর এদিকে বিশেষ নেই।

—কুমীরের জায়গা নিয়েছে দারিদ্র্য। আগে এদিকে এত দারিদ্র্য ছিল না। এই যে এর এক বন্ধুকেই তো কদিন আগে বাঘে নিয়ে গেছে।

সাধুচরণ এক মনে নিজের পায়ের নোখ দেখছে।

—বোসো, সাধু। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

—আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মাস্টারমশাই ?

—মনোরঞ্জনকে কী করে বাঘে ধরলো, আমাকে বুঝিয়ে দাও তো ? সত্যি করে বলো। কোন্ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলে তোমরা ?

এই জন্যই তো সাধুচবণ আসতে চায় না মাস্টারমশাইয়ের কাছে। সবাই জানে, মিথ্যে কথা বলার সময় সাধুচরণের চোখের পাতা কাঁপে না। কিন্তু এই মানুষটির কাছে এলেই তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। তবু, এই ব্যাপারে চোখের পাতা কাঁপালে কিছুতেই চলবে না। আকবর মণ্ডলের কাছ থেকে পারমিট সে জোগাড় করেছিল নিজের দায়িত্বে। সাত নম্বর ব্লকের কথা জানাজানি হলে আকবর মণ্ডল বিপদে পড়বে। তখন সে সাধুচরণকেও ছাড়বে না।

কথাটা ঘুরিয়ে সে উত্তর দিল, ফরেস্টের বড়বাবুকে সেখানে নিয়ে গিস্‌লাম, তিনি নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন।

—কী হয়েছিল গোড়া থেকে আমায় বলো তো।

একটু থেমে থেমে, সাহিত্যিকদের চেয়েও সতর্কভাবে শব্দ নির্বাচন করে সাধুচরণ পুরো ঘটনাটির বিবরণ দিল আবার। তারপর সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোন জায়গায় ভুল করে নি।

পরিমলের সঙ্গে অরুণাংশুও আংশিক মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা শুনলেন। বাঘের গল্পে খানিকটা রোমাঞ্চ থাকেই, শুনতে শুনতে মনের মধ্যেকার শিশুটি জেগে ওঠে।

অরুণাংশুর দিকে তাকিয়ে পবিমল বললেন, এর গল্পের কতখানি মিথ্যে বল্ তো ? ঠিক পঞ্চাশ ভাগ।

সাধুচরণ চমকে মুখ তুলতেই পরিমল বললেন, তোমরা যে কোর-এরিয়ার মধ্যে গিয়েছিলে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঐ সত্যি কথাটা কারুর কাছে বলো না। আমার কাছে যে ভাবে মিথ্যে গল্পটি চালালে, অন্যদের কাছেও ঠিক সেই ভাবেই বলবে।

দলের লোকদেরও বলে রাখবে, যেন ফাঁস করে না দেয়।

এতক্ষণ বাদে সত্যিকারের আশ্বস্ত হলো সাধুচরণ।

—মনোরঞ্জন খাঁড়া···ছেলেটিকে দেখেছি আমি নিশ্চয়ই···

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই, আপনি অনেকবার দেখেছেন···কো-অপ থেকে জিনিসপত্তর ধার নেবার জন্য ও-ই তো আপনার কাছে হাঁটা-হাঁটি করেছিল···

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো। আমি ওকে ভালোরকম চিনি··· জ্বরের জন্য মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে—বেশ তেজী ছিল ছেলেটা।

—ও এমনভাবে চলে গেল···এটা ভগবানের অন্যায়···বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বউ···

পরিমল সস্নেহে তার বাহু ছুঁয়ে বললেন, এই লোকটি গত বছর ধান কাটার সময় একটা জমিতে লাঠি হাতে নেমেছিল। নিজের জমি নয়, এক গরিব চাষীর জমি, ও সাহায্য করতে গিয়েছিল নিঃস্বার্থ ভাবে। সেজন্য জেল খেটেছে। জেল থেকে ফেরার পর আমি বলেছিলাম ওকে একটা কাজ দেবো। আমাদের স্কুলে একজন দফ্‌তরি লাগবে। কিন্তু গভর্নিং কমিটির মিটিং না হলে তো—

অরুণাংশু বললেন, এরকম একটা লোক ইস্কুলের দফ্‌তরি হবে, ছ্যাট্‌স এ পিটি।

—তা হলে ওর দ্বারা আর কী করা সম্ভব? ওর নিজস্ব জমিও বিশেষ নেই...

—অন্য দেশ হলে এরকম ভালো চেহারার মানুষ কুস্তিগির কিংবা বক্সার হতো। ট্রেনিং পেলে খেলা থেকেও কত টাকা রোজগার করা যায়।

—ওসব আকাশ কুসুম। এইসব ভূমিহীন লোকেরা সারা বছরই থাকে দৈনিক জন্‌-খাটার আশায়। বছরে কয়েক মাস কোনো কাজই পায় না। প্রত্যেকদিনের খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলে তারপর এদের অন্য কাজে লাগানো যায়। সেই জন্যই ভেবেছিলুম ইস্কুলের দফ্‌তরির

চাকরিটা দিয়ে ওকে কো-অপারেটিভের কাজে মাতিয়ে তুলবো। কিন্তু আমি জানি, চাকরিটা দিলেও ও রাখতে পারবে না, দু-এক মাস বাদে পালিয়ে যাবে।

—না, কাজ ছাড়বো কেন মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ ছাড়বে আমি জানি। বুঝলি অরুণাংশু, এটাই এদের নেশা। এই নদী, এই জঙ্গল এদের টানে, সেই জন্য বার বার এরা বিপদের মুখে যায়। এখন জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার কোনো দরকার ছিল না, আর দু মাস অপেক্ষা করলেই ও চাকরি পেত, কিন্তু ও নিজেই অন্য ছেলেগুলোকে তাতিয়ে বাঘের মুখে নিয়ে গেছে। কী সাধু, অস্বীকার করতে পারবে?

সাধুচরণের মুখে একটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে ধরনের হাসি ফুটে উঠলো। এবার সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে সত্যি কথা বলবে। যত গরীবই হোক, তবে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে খুব একটা অহঙ্কার আছে। নিজের অভাবের কথা কেউ কেউ অন্যকে জানাতে চায় না, যখন জানাতে বাধ্য হয়, তখন ঐরকম হাসি লেগে থাকে সেই মানুষের ঠোঁটে।

—মাস্টারমশাই, কিছুতেই আমার খিদে মেটে না। রোজ যা খাই সব সময় তবু পেটে খিদে খিদে থাকে। আমি একটু বেশী ভাত খাই, কিন্তু অত ভাত দেবে কে? কার্তিক-অঘ্রাণ মাস থেকেই, বুঝলেন মাস্টারমশাই, আপনি তো জানেন, ভাতে টান পড়ে যায়, বউটা তো কম খেয়েই থাকে…ছেলে মেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে, তাদের না দিয়ে আমি নিজে খাই কি করে? বর্ষা নামলো না! জমির কাজ নেই…আর দুটো মাস বসে থাকা…তাই ভাবলুম, জঙ্গলে যদি একটা খেপ মেরে আসি…

কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে সে উদাস হয়ে যায়। ঠিক মতন ভাষা খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে পিতা হয়ে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবে।

পরিমল আবিষ্টভাবে তাকালেন অরুণাংশুর দিকে। ভাবখানা এই, শুনেছিস তো। একটু আগে তোর নিজের দুঃখের কথা বলছিলি, এই ছাখ, সত্যিকারের দুঃখ কাকে বলে!

—মাস্টারমশাই, আমাকে যদি বাঘে ধরতো, তাতেও আমার কোনো দুঃখ ছিল না, খিদে সহ্য করার চেয়ে...কিন্তু মনোরঞ্জন...ওকে আমরা সঙ্গে নিতে চাই নি, নিয়তি ওকে টেনেছে...তবে ওরও ঘরে ভাতের টান পড়েছিল...

—যাকগে, মনোরঞ্জন তো গেছে···এখন তার বাড়ীর কি অবস্থা?

—ঐ যেমন হয়। আপনাকে আর বেশি কি বলবো, আপনি তো সবই জানেন···

—মনোরঞ্জনের স্ত্রী চলে গেল, তাকে তোমরা আটকাতে পারলে না? এখনো শান্তি স্বস্ত্যয়ন হলো না।

সাধুচরণ চমকে উঠে বললো, সে আপনার এখানে নেই?

—ছিল তো, তারপর তার বাবা-কাকা এসে নিয়ে গেল জোর করে।

—নিয়ে গেল? আপনি যেতে দিলেন?

—আমার তো তখন অসুখ...তা তার বাবা কাকা নিতে চাইলে আমরা আটকাবার কে? তোমাদের গ্রামের বউ...স্বামী মরতে না মরতেই...

—কী করবো, মনার মা যে বড় চ্যাঁচামেচি শুরু করলো। এমন করতে লাগলো যে বাড়িতে কাক চিল পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না।

—ঠিক আছে, আমার পায়ে একটু জোর আসুক, তারপর আমি গিয়ে এমন ওষুধ দেবো যে দেখবে তক্ষুনি মনোরঞ্জনের মায়ের চ্যাঁচানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধুচরণ এতক্ষণ বাদে খেয়াল করলো যে কয়েকদিনের অসুখেই পরিমলমাস্টার বেশ রোগা হয়ে গেছেন। দাড়িও কামান নি।

—ও শুয়োরের বাচ্চারা কী বোঝে?

সাধুচরণ এবং পরিমল দুজনেই চমকে তাকালেন অরুণাংশুর দিকে। ওঁদের দুজনের কথার মাঝখানে অরুণাংশুর এই চিৎকার এমনই অপ্রাসঙ্গিক যে ওঁরা বিমূঢ় হয়ে যান। অরুণাংশু তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। ওঁরা কী করে বুঝবেন যে অরুণাংশুর এই হুঙ্কার তাঁর অনুপস্থিত সমালোচকদের উদ্দেশ্যে।

অরুণাংশু উঠে বসে আবার বললেন, ওরা কী জানে, এখনও আমি কত কষ্ট করি? এক একটা লেখার জন্য দিনের পর দিন ছটফট করতে হয়, আমি কাঁদি, আমার মন-গড়া চরিত্রগুলোর জন্য আমার যে কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়…সেই সময় অন্য লোকজনদের সঙ্গে তারা যা কথাবার্তা বলে আমার মাথায় কিছু ঢোকে না…কেউ বুঝবে না, আমার কষ্ট কেউ বুঝবে না…

সাধুচরণ হাঁ করে অরুণাংশুর কথা শুনছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার।

অরুণাংশুর বৈরাগ্য তিনদিন স্থায়ী হলো। মাঠে হালধরা কিংবা খাল কাটার জন্য কোদাল ধরার সম্পর্কে চিন্তা ত্যাগ করে তিনি আবার শহরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ছুটলেন। ফেরার পথে গোসাবায় এক পরিচিত এস ডি পি ও'র সঙ্গে দেখা। ইনি পুলিশ হলেও সাহিত্য-রসিক, অরুণাংশুর এক বন্ধুর বন্ধু, সেই সুবাদে অরুণাংশুকে খাতির করে তুলে নিলেন নিজের লঞ্চে।

তারপর চললো খানাপিনা। আবার সারাদিন ধরে নেশা, লোকজনকে ধমক ও গান। আত্মবিস্মৃতির যতগুলি উপায় আছে কোনোটাই অরুণাংশু বাদ দিলেন না। ক্যানিং-এ না গিয়ে ফের চলে গেলেন নামখানায়। সেখান থেকে রায়দীঘি। সেখানেও এক পরিচিত সরকারী অফিসার থাকেন, তাঁর কোয়ার্টারে কাটলো দুদিন।

কলকাতায় ফিরে, এই কয়েকদিনে যা টাকা পয়সা খরচ হয়েছে সেটা তোলবার জন্য একটা লেখা তৈরি করে ফেললেন চটপট।

খবরের কাগজে একটা যা হোক কিছু লিখলেই তাঁকে শ' দুয়েক

টাকা দেয়। সব সময়ই অরুণাংশুর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যত খরচ বাড়ে, ততই বেশি লিখতে হয় রোজগারের জন্য। বেশি লিখতে লিখতে ধরে যায় বিরক্তি। তখন সেই বিরক্তি কাটাবার জন্য বাইরে যাওয়া, তার জন্য আবার খরচ...

কী লিখি, কী লিখি, ভেবে অল্পক্ষণ মাথা চুলকোতেই একটি চমৎকার বিষয়বস্তু মনে পড়ে গেল। বাঘের মুখে নিহত এক ব্যক্তির সদ্য বিধবা পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পুরো লেখাটির জন্য রইলো সত্য ঘটনার উত্তাপ।

বাসনার সঙ্গে অরুণাংশু একটি কথাও বলেন নি। এমন কি চোখের দেখাও হয়নি। তবু এই কাল্পনিক সাক্ষাৎকারটি এমনই মর্মস্পর্শী হলো যে পাঠক-পাঠিকার চিঠি এলো ষাট-সত্তরটা। কয়েক-জন সরকারী অফিসার সেই লেখাটি একজন মন্ত্রীর নজরে আনলেন। মন্ত্রীর তো পড়বার সময় নেই। বিষয়বস্তুটি জেনে নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন একটি ফাইল খোলার জন্য। নাজনেখালির মনোরঞ্জন থাঁড়া মহাকরণের নথীপত্রে অমর হলো।

সেই মানুষটির উত্তাপ

এইখানে এসে প্রথম বসেছিল মনোরঞ্জন। এই জলচৌকিতে, মেঝেতে ছিল আল্পনা আঁকা। জামাই আসবে বলে এই ঘরখানাই বানানো হয়েছিল নতুন, সব কিছুতেই নতুন-নতুন গন্ধ।

জলচৌকিটা নেই, ঠিক সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। ঘোর দুপুর। থান কাপড় পরা বাসনার মুখখানিতে স্বপ্ন মাখা। ঘরে এখন আর কেউ নেই, বাসনা অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ চুপচাপ। কিন্তু তাকে দেবী-প্রতিমার মতন দেখাচ্ছে, একথা বলা যাবে না। কারণ বাসনা সেরকম একটা কিছু দেখতে ভালো নয়। নাকটা বোঁচার দিকেই, মুখখানা গোলগাল, আব এক ইঞ্চি লম্বা হলেই ওকে আব বেঁটে বলা যেত না। তবু এই বাইশ বছর বয়সে বাসনা কোনোদিন এমন স্তব্ধ, স্থির ভাবে এতক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি, সেইজন্য তাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে ঠিকই।

—তোমাব ডাক নাম বাসি, তাই না?

—মোটেই না।

—কেন লুকোচ্ছো? বাসনাব ডাক নাম বাসি হবে না তো কী হবে? ঠিক বাসি বাসি চেহারা।

—আমার কোনো ডাক-নামও নেই।

—বুঝেছি। কলাগাছের বাস্না হয় জানো তো? তোমায় নিশ্চয় বাপের বাড়ি সবাই বাস্না বলে ডাকে। নামখানা কী মানিয়েছে, একেবারে সাক্ষাৎ কলাগাছ।

—আর তোমার নামখানাই বা কী?

—আমার মতন এমন ভালো নাম হোল্ টুয়েন্টি ফোর পরগনাজ্-এ আর কারুর আছে? খুঁজে বার করো তো আর একটা মনোরঞ্জন?

—আর খাঁড়া? শুনলেই তো ভয় করে।

—ভয় তো করবেই। আমাদের কী যে-সে বংশ?

—তোমাদের বংশের আগেকার লোকেরা ডাকাত ছিল, তাই না?

—ডাকাত? আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিল কর্ণগড়ের রাজার সেনাপতি। মিদ্‌নাপুরে এখনো আছে কর্ণগড়। বীরের যা যোগ্য কাজ, লহ খড়গ, বধো এই বিশ্বাসঘাতকে' ..পতিঘাতিনী সতী পালা দেখোনি? সেই খড়গ থেকে খাঁড়া।

—হি-হি-হি-হি, সেনাপতি? তরোয়াল কোথায়?

—আমার ঠাকুর্দা মিদ্‌নাপুর থেকে চলে এস্‌ছিল এই বাদায়। অনেক জমি জায়গা ছিল আমাদের। নদীতে সব খেয়ে নিয়েছে। আমার ঠাকুর্দাকে দেখলে ডাকাতরাও ভয়ে কাঁপতো ..সত্যি সত্যি তরোয়াল ছিল আমাদের বাড়িতে...শুনিছি, সেটাও গেছে নদীর পেটে।

—আমরাও মেদিনীপুর থেকে এস্‌ছি।

—জানি। চুরি করে পালিয়ে এস্‌ছিলে। তাই তোমাদের পদবী সাধু।

—এই, এই ভালো হবে না বলছি।

—তোমার কাকাটাকে তো একদম চোরের মতন দেখ্‌তে!

এই হচ্ছে মনোরঞ্জন-বাসনার মধুযামিনীর নিভৃত সংলাপের অংশ। প্রতিটি শব্দ মনে আছে বাসনার। লোকটা খুব রাগাতে ভালোবাসতো। আর যাত্রা-পালার কত কথা সে মুখস্থ বলতে পারতো পটাপট।

বিয়ের পর মাত্র একবারই সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল মনোরঞ্জন। তিনটি রাত কাটিয়ে গেছে এই ঘরে। শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক প্রথম থেকেই একটু চিড়ধরা ছিল। মনোরঞ্জনের ধারণা তাকে

যথেষ্ট খাতির করা হয় না। সে বেলে মাছ খায় না জেনেও তাকে বেলে মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়েছিল। বেলে, গুলে, ন্যাদোস— এই সব কাদা খাওয়া মাছ মনোরঞ্জন পছন্দ করে না। বাসনা তো জানতো, সে কেন তার বাপ-মাকে বলে দেয় নি? এরা সবাই মাছের দেশের লোক, নতুন জামাইকে খাসীর মাংস খাওয়াতে পারে নি একদিন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মনোরঞ্জনদের তুলনায় বাসনার বাবা-কাকার অবস্থা কিছুটা ভালো। শ্রীনাথের বার বিঘে খাস জমি। তা ছাড়া কিছু খুচরো ব্যবসা-পত্তর আছে। নাজনেখালির তুলনায় মামুদপুর অনেক বর্ধিষ্ণু জায়গা। কিছু দোকানপাট আছে, দিনে দুবার লঞ্চ আসে, তাছাড়া আসে ব্যাঙ্কের লঞ্চ। সুতরাং মনোরঞ্জনের মতন গোঁয়ারগোবিন্দ এবং গরিব পাত্রের তুলনায় আরও কিছুটা অবস্থাপন্ন ঘরের ভালো ছেলের সঙ্গে বাসনার বিয়ে হতে পারতো। কিন্তু ঐ যে বলে না, কপালের লেখা।

বাসনার বিয়ে দিতে হলো তো খুব তাড়াহুড়ো করে। শ্রীনাথ সাধুর বরাবরের গোঁ, মে[illegible]নীপুরের লোক ছাড়া অন্য কোন ঘরে মেয়ে দেবে না। এদিকে ফটিক নামে এক বাঙাল ছোঁড়া বাসনার পেছনে লাগলো। সে ছোঁড়াটা একেবারে হাড় হারামজাদা। এমন ভালো মেয়ে বাসনা, তার কানে ঐ ফটিক এমনই ফুসমন্তর দিয়েছিল যে তাতেই বাসনার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঐ ফটকের সঙ্গে বাসনা রওনা দিয়েছিল হাসনাবাদের দিকে, ভাগ্যিস পথে নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায়! ন্যাজাটের লঞ্চ ঘ[illegible]য় নিতাইচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মহাজনের সঙ্গে হিসেব-পত্তর কষছিল, হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো, লঞ্চের খোলে বসে আছে বাসনা। প্রথমে নিতাইচাঁদ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। বোকা-বোকা লাজুক মেয়ে বাসনা, কোনদিন একলা বাড়ির বাইরে পা দেয় নি, সে কিনা লঞ্চে? সঙ্গে কে আছে? তক্তা তুলে নিয়ে লঞ্চ তখন সবেমাত্র জেটি ছেড়েছে,

নিতাইচাঁদ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওরে থামা, থামা। ও সারেং ভাই, লঞ্চ ভিড়োন আবার।

বাড়িতে এনে বাসনাকে আগা-পাশ-তলা পেটানো হয়েছিল, তার মুখ থেকে জানাও গিয়েছিল ফুসলাইকারীর নাম। কিন্তু ফটিককে তো কিছু বলা যায় না, তাহলেই সব জানা-জানি হয়ে যাবে যে! তখন সাত তাড়াতাড়ি করে মেয়ের বিয়ে না দিলে চলে না। মেদিনী-পুরের ভালো ছেলে ঠিক তক্ষুনি আর পাওয়া গেল না। যে-দু'চারজন উপযুক্ত পাত্র ছিল, গরজ বুঝে বেশী দর হাঁকে। শেষ পর্যন্ত শ্রীনাথের শালা ঐ নজেনেখালির মনোরঞ্জনের সন্ধান আনলো, আর হুট করে বিয়ে হয়ে গেল।

বাসনার মা সুপ্রভা বলেছিল, তা যাই বলো, জামাই আমার খারাপ হয়নি। চেহারা গতর ভালো, বুদ্ধি আছে, গায়ে খেটে একদিন উন্নতি করবে ঠিকই। শ্রীনাথ বিয়ের দিনই জামাইকে আভাস দিয়েছিল, সে যদি নাজনেখালি ছেড়ে মামুদপুরে এসে থাকতে চায়, তাহলে এখানে তার জন্য বিঘে পাঁচেক জমির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাইতেই মনোরঞ্জন চটে আগুন! সে বছরের অর্ধেক সময় অপরের জমিতে জন খাটে বটে, কিন্তু সে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে, যাত্রা-নাটক থেকে সে কত বীরপুরুষ আর আদর্শবান ব্যক্তির কাহিনী জানে, সে হবে ঘর জামাই?

সেইজন্যই তো মনোরঞ্জন বাসনার কাছে প্রতি কথায় একবার করে শ্বশুরবাড়িকে ঠোকে।

—তুমি কলকাতা দেখেছো?

—না।

—গোসাবা?

—ওমা, গোসাবা দেখবো না কেন? একবার ক্যানিং পর্যন্ত গেসলাম, কলকাতা যাবো বলে, ও হরি, সেখানে দেখি রেলগাড়ি চলছে না, রেলগাড়ির হরতাল। ব্যাস্ আর যাওয়া হলো না।

—সে তো অনেক দিন আগে ট্রেনের হরতাল হয়েছিল। তারপর আর যেতে পারোনি ?

—না যাইনি, কে নিয়ে যাবে ?

—তোমার বাপ-মা একেবারে চাষাভুষো ক্লাস। মেয়েকে একবারও কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারেনি পর্যন্ত। তোমাদের বাড়ির কেউই নিশ্চয়ই কখনো কলকাতা যায় নি।

—আমার কাকা প্রত্যেক মাসে একবার কলকাতায় যায়।

—চোরাই মাল বেচতে, তা জানি!

—এই, আবার সেই এক কথা।

—তোমার কাকার চেহারা অবিকল চোরের মতন নয়!

—মোটেই নয়।

—তোমার বড়দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে খেয়ার নৌকো চালায় না ?

—বড় জামাইবাবু? উনি তো ইস্কুলের মাস্টার।

—হেঃ! খলসেখালিতে ইস্কুলই নেই, তার আবার মাস্টার! আমি খলসেখালিতে যাইনি ভেবেছো ?

—ইস্কুল তো পাশের গ্রামে। জামাইবাবু রোজ হেঁটে যাওয়া আসা করেন।

—তাহলে তোমার জামাইবাবুর ছেলে ওখানে খেয়ার নৌকো চালায়।

—তা চালাতে পারে। তাতে দোষের কী হয়েছে ?

—না একদিন দেখছিলাম কিনা, ছেলেটা মার খাচ্ছে! ইজারাদারের কাছে পয়সা জমা দেয়নি। চুরি করেছিল। চোরের বংশ! কালো হ্যাংলাপানা একটা ছেলে আছে না তোমার দিদির? খুব পিটুনি খেয়েছে।

—সে মার খাচ্ছিল, তাও তুমি থামাতে যাওনি ?

—তখন কি জানি ঐ ছেলের মাসীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে ?

শুধু শুধু একটা চোরকে আমি বাঁচাতে যাবো কেন ?

—এ কি অদ্ভুত মানুষ রে বাবা।

—হ্যাঁ, আমি দস্তুর মতন অদ্ভুত। সমুখেতে দেখিতেছি অদ্ভুত এক। নিরাকার নহে নহে, উজ্জ্বল বসনে…

—এই, একটা কথা বলবো ?

—কী ?

—আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে ?

—খুব শখ, না ?

—বলো না, নিয়ে যাবে কি না ?

—আচ্ছা নিয়ে যাবো। তোমার বাপ তোমায় কলকাতা দেখায় নি, আমি দেখাবো। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা।

জামাই বলে তো আর কোঁচা ঝুলিয়ে, চুলে টেরি কেটে ফুলবাবুটি হয়ে বসে থাকবে না। চাষীর ছেলে মনোরঞ্জনের ওসব শখও নেই। হ্যাঁ, প্রথম বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসবার সময় সে মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর নীল রঙের শার্ট পরে এসেছিল বটে, পায়ে রবারের কাবুলি, কিন্তু আসা ইস্তক সে জুতো ও শার্ট খুলে রেখেছিল। মামুদপুরে ভালো বীজ ধান পাওয়া যায় শুনেছিল, সে একবার হাটখোলার দোকানগুলোয় খোঁজ নিয়ে এলো। ফিরে এসে দেখলো ডাব পাড়ার তোড়জোড় চলছে। এটাই তার জন্য এস্পেশাল খাতির।

শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ বাড়ি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। শ্রীনাথের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে বাড়িতে আছে দুই ছেলে, বড়টি বিবাহিত, ছোটোটির বয়স বছর চোদ্দ। শ্রীনাথ একটু দুর্বল স্বভাবের বলে নিতাইচাঁদ এখনো সর্দারি করে এ সংসারে।

দু বাড়ির মাঝখানে ডাব গাছ, কিন্তু দু বাড়িতে একজনও লোক নেই ডাব পাড়ার। বাসনার ভাইটা কোনো কম্মের না। এ বাড়ির বাঁধা মুনীষ কালাচাঁদকে খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সে গেছে

জমিতে। লালমোহন বলে আর একজন আছে ডাব পাড়ায় ওস্তাদ, তাকে ডাকতে গিয়েও ফিরে এলো বাসনার ভাই। লালমোহনের কোমরে ব্যথা।

ওই সব দেখেশুনে আর থাকতে পারেনি মনোরঞ্জন। এই সব লোকগুলো কী? বাড়িতে গাছ পুঁতেছে, আর ডাব পেড়ে দেবে অন্য লোক এসে? বাসনার কাকা নিতাইচাঁদ শুধু বাজখাঁই গলায় চ্যাঁচাতেই পারে। কাটারিখানা বাসনার ভাইয়ের হাত থেকে নিয়ে সে বললো, দেখি আমি উঠছি।

বাসনার ভাই বললো, দাঁড়ান, দড়ি আনি। পায়ে দড়ি বাঁধবেন না?

মনোরঞ্জন সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, আমার দড়ি লাগে না। এই তো বেঁটে বেঁটে গাছ এদিককার—।

এই নতুন ঘরের দরজার সামনে বাসনা দাঁড়িয়েছিল সেদিন। খুব গর্ব হয়েছিল তার। তাঁর স্বামীর যেমন গায়ের জোর, তেমনি সাহস, কী সুন্দর তরতরিয়ে উঠে গেল নারকোল গাছে। যেন চোখের নিমেষে! তারপর কোমর থেকে কাটারিখানা হাতে নিয়ে ঝকঝকে হাসি মুখে সে একবার তাকিয়েছিল বাসনার দিকে।

দরজার সামনে এসে বাসনা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে নারকোল গাছটার দিকে। গাছটা ঠিক একই রকম আছে। সবই ঠিকঠাক আছে আগের মতন, শুধু একজন নেই। অথচ ছবিটা সে স্পষ্ট দেখতে পায়। ঐ নারকোল গাছটার ডগায় একজন হাস্যময় মানুষের মুখ। মানুষটি নেই, কিন্তু হাসিটি ঐখানে লেগে আছে এখনো।

নিচ থেকে হা-হা করে উঠেছিল নিতাইচাঁদ। অতগুলোর দরকার নেই, অতগুলো লাগবে না, গোটা চারেক।

ততক্ষণে পুরো কাঁদিটাই কেটে ফেলেছিল মনোরঞ্জন। ধপ করে সেটা পড়লো নিচে। নতুন জামাই গাছ থেকে নেমে এসে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো খুড় শ্বশুরের দিকে। আশ্চর্য এদিককার লোকজন! ডাব আর নারকোলের তফাৎ চেনে না? এগুলো যে পেকে ঝুনো

হয়ে গেছে প্রায়, আর কতদিন গাছে থাকবে ?

ডাব হলে খেতো, কিন্তু নারকোলের জল বা শুধু নারকোল কোনোটাই সে খাবে না বলে খুব একটা ফাঁট দেখিয়েছিল মনোরঞ্জন। এ বাড়িতে সে সব সময় মাথা উঁচু করে থেকেছে।

আর তাস খেলা ? মামুদপুরের লোকেরা বিখ্যাত তেসুড়ে, এখানে টুয়েন্টি নাইন খেলার টুর্নামেণ্ট হয় পর্যন্ত। বাসনার দাদা বদ্যিনাথ তার বন্ধু বঙ্কাকে পার্টনার নিয়ে সেই টুর্নামেণ্ট জিতেছিল একবার। প্রত্যেক সন্ধেবেলা বদ্যিনাথের তাস খেলা চাই-চাই। এই উঠোনে মাদুর পেতে হ্যারিকেন নিয়ে বসেছিল তাসের আসর। মনোরঞ্জনও এক পাশে বসে গলা বাড়িয়েছে। নতুন জামাই এসেছে বাড়িতে, খেলায় না নিলে ভালো দেখায় না। কিন্তু মনে মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল বদ্যিনাথের, ওরা জঙ্গলের জায়গার লোক, ওরা তাস খেলার কী জানে !

বদ্যিনাথ ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে জামাই, খেলবে নাকি এক হাত !

মনোরঞ্জনও দিয়েছিল তেমন উত্তর।

—আমরা ব্রিজ খেলি। এসব টোয়েন্টি নাইন তো মেয়েদের খেলা। অনেকদিন অভ্যেস নেই, আচ্ছা দেখি তবু।

তারপর তো মনোরঞ্জন বসলো তাস খেলতে। রান্নাঘর থেকে আসা যাওয়ার পথে বাসনা ফিরে ফিরে তাকিয়ে যায় স্বামীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। এই যে পাঁচ ছয়জন পুরুষ মানুষ বসে আছে, তার মধ্যে মনোরঞ্জনের মাথাটাই যেন এক বিঘৎ উঁচু। চুলের ছাঁটও কত সুন্দর।

বাপরে বাপ, এ কী ডাকাতে খেলোয়াড়! পেয়ার না পেয়েও মনোরঞ্জন তেইশ পর্যন্ত ডেকে রং করে। প্রথম গোলামেই তুরুপ ? সেভেন্‌থ কার্ডে রং করেও সে খেলা জিতে যায় ? ডবল দিলেই রি-ডবল দেয়! একবার খেললো সিঙ্গিল হ্যাণ্ড। পরপর কালো

সেট খাওয়াতে লাগলো। অপনেণ্টদের।

শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের একজন, ছোট পাঁচু, স্বীকার করলো, দাদা, আপনি বললেন টোয়েণ্টি নাইন খেলা অব্যেস নেই, তাতেই এই খেলা? অব্যেস থাকলে না জানি কী হতো।

অবশ্য সেই খেলার আসরে একটা খুব মজার ব্যাপারও হয়েছিল।

তাস খেলায় গভীর মনোযোগ মনোরঞ্জনের, মাদুরের ওপর কী যেন সর সর করে যাচ্ছে, সেদিকে না তাকিয়ে সেখানে হাত দিয়ে চলন্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কী যেন ঠেকলো। সঙ্গে সঙ্গে সে, ওরে বাপরে, বলেই মারল এক লাফ। সে একখানা লাফ বটে। বক্কার মাথা ডিঙিয়ে পড়ল অন্য দিকে। বসে বসে কোন মানুষকে ওরকম ভাবে লাফাতে কেউ কখনো দেখেনি।

—সাপ! সাপ!

অন্য সবাই তখন হেসে একেবারে লুটোপুটি খাচ্ছে। বাড়ির বউ-ঝিরাও দৌড়ে এসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে শুরু করেছিল। হ্যাঁ, সাপ বটে, কিন্তু ওটা তো সেই ঢ্যামনাটা। ওটা বাস্তু সাপ, যখন তখন আসে। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা, রেল গাড়ির মতন লম্বা, অত বড় শরীরটা নিয়ে নড়াচড়া করতেই পারে না, ওকে দেখেই মনোরঞ্জনের এত ভয়?

এত হাসি হাসতে লাগলো সবাই যে খেলাই ভেস্তে গেল তারপর। যাক, নতুন জামাইকে একবার অন্তত জব্দ করা গেছে।

ছোট পাঁচু বলেছিল, দাদা, বসে বসে ওরকম আর একখানা লাফ দিয়ে দেখান তো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনোরঞ্জন বলেছিল, তোমাদের এদিককার লোক তো ঢ্যামনা ছাড়া আর কোনো সাপ দেখে নি, ওরা সাপের মর্ম কী বুঝবে? আমাদের অশ্বিনীকে যেবার কাটলো...

বাসনা স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি রাগ করো না, তুমি রাগ করো না—

—এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র তুমি ভালো। আর সব কজনা কেমন যেন বেয়াড়া।

—তুমি রাগ করো না।

এই সেই খাট। এবার ফিরে ঐ খাটে আর শোয় নি বাসনা। পুরুষালি উত্তাপের অভাবে ওটা এখন কী দারুণ ঠাণ্ডা।

যতবার মনোরঞ্জনের মুখখানা মনে পড়ে, ততবার বাসনার শরীরটা জ্বরের মতন ঝনঝনে গরম হয়ে যায়। মানুষটা নিজেও যেমন চনমনে, তেমনি অন্য কারুকে কখনো ঝিমিয়ে পড়তে দিত না।

ভর দুপুর বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই, বাসনার মা ঘুমাচ্ছে উঠোনের ওপাশে বড় ঘরটায়। নারকোল গাছের পাতায় সর সর সর সর শব্দ হতে লাগলো। জোর হাওয়া উঠেছে। কালো মেঘ থমথম করছে আকাশ। আজ বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হবেই হবে।

খাটের একটা পায়া ধরে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে থাকে বাসনা। এত কান্না কেঁদেছে এই কদিন, তবু ফুরোয় না, আবার চোখ ফেটে জল আসে. এত জল কোথায় জমা থাকে? যাদের চোখের জল খরচ হয় না, তাদের সেই জল কোথায় যায়? আর সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু একটা মানুষ নেই, তাতেই পৃথিবীটা শূন্য। চোখের সামনেই তাকে দেখা যায়, তার কথাও যেন সব এখনো কানে শোনা যায়, তবু সে নেই।...

—এই একটা কথা বলবো?

—কী?

—আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

—খুব শখ না?

—বলো না নিয়ে যাবে কি না?

—আচ্ছা নিয়ে যাবো। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায় নি আমি দেখাবো। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা...।

এ পক্ষ আর ও পক্ষ

মনোরঞ্জনের মা ডলির যদি চোপার জোর থাকতে পারে, তাহলে বাসনার মা সুপ্রভারই বা থাকবে না কেন ? সেই বা কম যায় কিসে ?

বাসনাকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই সুপ্রভা তার স্বামী ও দেওরকে একেবারে ধুইয়ে দিচ্ছে। উঃ এত বোকাও পুরুষ মানুষ হয় ? এরা বোধহয় কাছা দিয়ে ধুতি পরতেও জানে না। জানবেই বা কী করে, সর্বক্ষণ মোল্লাদের সঙ্গে মিশে মিশে লুঙ্গিই তো পরে। বাসনার বাপ তো চিরকালই একটা জল ঢোঁড়া কিন্তু নিতাইচাঁদ নিজে কী করে এমন গোখুরির কাজটা করলো ? এই সময় কেউ মেয়েকে ফিরিয়ে আনে ?

একে তো ভালো করে দেখে না শুনে হুট করে কোথাকার এক জংলী ছোঁড়ার হাতে তুলে দিল মেয়েকে। সম্বৎসরের খোরাকি ধান তোলার মতন জমি যাদের নেই, সে বাড়িতে কেউ জেনে শুনে মেয়ের বিয়ে দেয়। কেন তাদের মেয়ে কি জলে পড়েছিল ? এর চেয়ে যে বাঙ্গাল বাড়িতে বিয়ে দেওয়াও ভালো ছিল। এত জায়গা থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাদাবন থেকে জামাই আনতে হলো। ঐ রকম গুণ্ডার মতন চেহারা, ও বাঘের পেটে না গেলেও কোনোদিন নির্ঘাৎ পুলিসের গুলি খেয়ে মরতো। কী রকম ছোটলোকের বাড়ি ভেবে ছাখো, ছেলে মরতে না মরতেই ছেলের বউকে তাড়িয়ে দেয় ? এরকম কথা কেউ সাতজন্মে শুনেছে ? চশমখোর, চামার কোথাকার।

সুপ্রভার ঢ্যাঙা চেহারা, মুখে সব সময় পান, ঠোঁটের পাশ দিয়ে রস গড়ায়, মেটে সিঁদুরের বিষে সিঁথির দু'পাশে অনেকখানি চুল উঠে গেছে। সুপ্রভার স্তন দুটি বেশী লম্বা ও ঝোলা। পঞ্চাশ বছর

বয়েস পেরিয়ে যাবার পর তার আর লজ্জা শরমের বালাই নেই।

ঝগড়া-গালাগালি দেবার সময় সামনে পেলে প্রতিপক্ষ না থাকলেও সুপ্রভার কোনো অসুবিধে হয় না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তবু সুপ্রভার গালাগালির স্রোত চলেছে তো চলেছেই। এরই মধ্যে তার স্বামীকে মাঝে মাঝে খুঁজে এনে সে গলা চড়ায়।

ছি, ছি, ছি, পুরুষ মানুষ এমন বে-আক্কেলে হয়। হুঃ, পুরুষ মানুষ। সেই যে বলে না, গোঁফ নাইকো কোনোকালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে। একটা উটকপালে মাগীর কাছে জব্দ হয়ে এলো? যেমন দাদা তেমন ভাই। ধরলে চিঁ চিঁ ছাড়া পেলেই সিংগী। মেয়েটার হাত ধরে জেটিঘাটে নামলো, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। শাঁখাসিঁদুর পরিয়ে এই ক'মাস আগে মেয়েটাকে পাঠালাম, সেই কপাল-পোড়া মেয়েকে কেউ এমন-ভাবে নিয়ে আসে? কী আক্কেল।

এরকম চলতেই থাকে অনবরত বাক্যের স্রোত। এক একবার গলা খাঁকারি দিয়ে শ্রীনাথ বলবার চেষ্টা করে, আহা-হা, তখন থেকে যে বকেই যাচ্ছিস, আমরা কী করতুম আর? মেয়েটাকে বাড়ির বার করে দিয়েছে, জানা নেই শোনা নেই অন্যের বাড়িতে পড়ে আছে, সেখানে ফেলে রাখা কি ভালো দেখায়? কপাল যখন পুড়েছেই— আমাদের মেয়েকে দুটো ভাত-কাপড় আমরা দিতে পারবো না?

সুপ্রভা চোখ কপালে তুলে বলে, হায় আমার পোড়া কপাল। কোন্‌ঠেকায় কথা কোন্‌ঠে গেল। চত্তির মাসে বান হৈল। মেয়েকে ভাত-কাপড় দিতে পারবো না, সে কথা বলিছি? ওগো বুদ্ধির ঢেঁকি একথা বুঝলে না যে মেয়েটাকে ওরা একেবারে বেড়াল পার করে দিল? এর পর ওরা বলবে, শ্রাদ্ধ চুকবার আগেই বউ চলে গেল, ঐ বউয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই। হা-ঘরে বংশের লোক ওরা, ওরা সব পারে।

শ্রীনাথ বললো, সম্পর্ক নাই তো নাই। কে আর ওদের ঘরে মেয়েকে পাঠাচ্ছে। সে তুই যাই বলিস বোকার মা, আমার মেয়েকে আমি আর কোনোদিন ঐ নাজনেখালির ছোটলোকের বাড়িতে পাঠাবো না। এই একখান কথা আমি কয়ে দিলাম।

—এঃ। মরদ বড় তেজী, মারবেন বনের বেজী। একখান কথা আমি কয়ে দিলাম? বলি, দুকানে দুটো ফুল, নাকছাবি আর দুগাছা চুড় যে দিয়েছিলুম, সেগুলো যাবে কোথায়? সেগুলো এনেছো, আটমাসের বিয়ে, তার জন্য আমরা ঘরের সোনা-গচ্চা দেবো?

এবার শ্রীনাথের সম্বিৎ ফেরে। চটাস করে গালে হাত দিয়ে সে বলে, তাই তো?

নতুন ঘরে শুয়ে থেকে মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে এত শোক-দুঃখের মধ্যেও এই কথাটি শুনে বাসনাও চমকে ওঠে। সোনার জিনিসগুলো তো আনা হয় নি? একবার মনেও পড়ে নি সে কথা।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বুকের লাউ দুটো দুলিয়ে এক পাক ঘুরে গিয়ে সুপ্রভা বললো, তবে? আমাদের হক্কের সোনা ওর ঐ শাশুড়ি মাগীটা কেন ভোগ করবে? কেন, শুনি? কেন? কেন?

—তাই তো।

—শুধু তাই তো বললেই কাজ হবে? হাসিও পায়, কান্নাও ধরে একথা আর বলি কারে? আর আমাদের ঐ জমি?

—আমাদের জমি?

—সে জমিটা আমরা এমনি এমনি মিনি মাগনা ছেড়ে দেবো?

—কী বলছিস তুই আমাদের জমি কে নেবে?

—আমাদের নয়তো কার? বিয়ের ট্যাকায় মনোরঞ্জন এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমিটা কেনে নি?

—ওঃ হো।

—ফের ওঃ হো? তোমার মাথার ঘিলু দিয়ে গণ্ডাখানেক

ঘুঁটে হবে শুধু। সে জমি কার? ওর বাপের না চোদ্দ পুরুষের? আমাদের টাকায় জমি কিনেছে মনোরঞ্জন, গোঁয়ারের মতন সে জঙ্গলে মলো, এখন ও জমি আমরা ভূতের হাতে ছেড়ে দেবো? অ্যাঁ? বাপের নামে কেনে নি, মনোরঞ্জন জমি কিনেছে নিজের নামে, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী পাবে সেই জমি। পাবে না? বাসনা যদি ওখেনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতো, ওর জমি কেউ নিতে পারতো? এসব ব্যবস্থা না করে তুমি মেয়েটাকে খালি হাতে নিয়ে চলে এলে?

স্ত্রীর বুদ্ধির কাছে হার মেনে শ্রীনাথ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। ওপাশ থেকে নিতাইচাঁদও শুনে ভাবে, এঃ হে, বড়ই কাঁচা কাজ হইয়ে গিয়েছে তো।

এবারে ওদিকের দৃশ্য দেখা যাক।

নাজনেখালিতে বিষ্ণুপদ খাঁড়ার বাড়ি একেবারে শান্ত। এদিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে বিষ্ণুপদ মাঠে গেছে বীজতলা রুইতে। রান্না ঘরের উনুন থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া, ভিজে কাঠের আঁচ। উঠোনে বসে থুপথুপিয়ে কাপড় কাচছে ডলি, দাওয়ায় বসে কবিতা শেলাই করছে তার ব্লাউজ। স্বয়ং বিধাতা পুরুষও এখন হঠাৎ এসে পড়লে বুঝতে পারবেন না যে মাত্র কয়েক দিন আগে এ বাড়ির একটি সমর্থ, বলিষ্ঠ যুবা-ছেলে বাঘের মুখে মারা গেছে।

বিধাতা পুরুষের বদলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন পরিমল মাস্টার। সঙ্গে সাধুচরণ। ডলি ওদের দেখেও দেখলো না। আড় চোখে একবার তাকিয়ে বেশি মন দিল কাপড় কাচায়।

সাধুচরণ বললো, ও মাসী, মাস্টারমশাই এশ্চেন।

—তা আমি কী করবো? বাড়ির লোক এখন বাড়িতে নেই।

কবিতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অভিভূত শ্রদ্ধা। পরিমল মাস্টার তার চোখে সিনেমার নায়কের সমতুল্য। কত বড় বিদ্বান, অথচ সাধারণ চাষাভূষোর কাঁধে

হাত দিয়ে কথা বলেন, ঠিক চাষীদের মতন মাঠে উবু হয়ে বসেন।

ডলির থুপথুপুনির শব্দ বেড়ে গেছে। ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তার একটা রাগ আছে, সে তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে যে তাদের বহু দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী শহরের লোকেরা। তা ছাড়া মাস্টার শ্রেণীর ওপর তার একটা জাত ক্রোধ আছে, খুব গোপনে। তার প্রথম যৌবন বয়েসে, এক ছোকরা ইস্কুল মাস্টার অনেক মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা বলে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়েছিল। তখন ছিল সুখ, এখন সেই স্মৃতি ডলির কাছে বিষ। সেই মাস্টাব তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পালিয়েছিল।

কবিতা চাটাই পেতে দেবার আগেই পরিমল এসে বসলেন দাওয়ার এক কোণে। তারপব বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

ডলি কোনো উত্তর দিল না, মুখও ফেরালো না।

—বাড়ি থেকে বৌটাকে তাড়িয়ে দিলেন?

—বেশ করেছি।

একেবারে ফোঁস ক'র উঠলো ডলি। দর্পিতার মতন ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, বাড়ি থেকে অলক্ষ্মী ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি, এখন আমার শান্তি। ছেলে তো গেছে গেছেই? ঐ ভাতার-খাগীকে দুধ কলা দিয়ে পুষবো কেন?

সাধুচরণ অসহিষ্ণু ভাবে বললো, ও মাসী কী হচ্ছে? একটু চুপ করো না—

পরিমল মাস্টার হাসলেন।

নাটক-নভেলে প্রায়ই গ্রামের আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষকের একটা চরিত্র থাকে। তাদের পোশাক হয় পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে পথিক-ঝোলা। বড় বড় চুল। রবি ঠাকুরের ভাষায় কথা বলে। পরিমল মাস্টারও সেই টাইপের চরিত্র হলেও এই সুমহান ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেন নি পোশাক ও কথাবার্তায়। পরনে সেই

লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের চটি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

ঈষৎ কৌতুকের সুরে, যেন ডলিকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই তিনি বললেন, কাজটা আপনি ভালো করেন নি।

—ভালো করিছি কি মন্দ করিছি সে আমি বুঝবো। অন্য কারুর ফোঁপড়-দালালি করবার দরকার নেই। যার জন্য আমার ছেলেটাই চলে গেল, সেই রাক্ষুসীকে আমি বাড়িতে রাখবো?

—কিন্তু এ জন্য পরে যদি আপনাকে পস্তাতে হয়?

রাগের চোটে ডলি প্রায় লাফাতে শুরু করে দিল। মাস্টার-বাবুটির এই ধরনের গেরেমভারি কথা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

সাধুচরণ থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো তাকে। পরিমল মাস্টার যেন ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছেন।

সাধুচরণের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, বিড়ি আছে?

বিড়িটি ধরিয়ে তিনি বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি। রাগ-মাগ না করে মন দিয়ে শুনুন। কাগজপত্রে আপনার ছেলের-বউয়ের কয়েকটা সই লাগবে। মনোরঞ্জনের নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

—কে কিসে সই করবে, তার আমি কী জানি?

—কত টাকা বললুম, শুনতে পেয়েছেন? বারো হাজার টাকা। আপনারা পাবেন।

একজন জাদুকর এসে জাদুর মায়া ছড়িয়েছে। ডলি, সাধুচরণ আর কবিতা নিশ্বাস বন্ধ করে, স্থির চক্ষে চেয়ে আছে জাদুকরের মুখের দিকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পরিমল সাধুচরণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোরা যাবার আগে ফর্ম সই করে নিইয়েছিলাম, মনে আছে? আমি জানি তো তোদের ধরন। তোদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে রাখা আছে। একজন

কেউ বাঘের পেটে গেলে তার নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তুই মরলে তোর পরিবারও পেত।

—মাস্টারমশাই, আপনি আগে তো বলেন নি?

—কেন আগে বললে তুই ইচ্ছে করে বাঘের পেটে যেতি?

বালতির জলে খলবলিয়ে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে ডলি দৌড়ে চলে এলো কাছে।

—বারো হাজার টাকা পাবো? সে কত টাকা?

পরিমল জিজ্ঞেস করলেন জমির দর এখন কত যাচ্ছে রে সাধু? বারো শো টাকা নয়? তা হলে ধরুন, এক লপ্তের দশ বিঘে ধান জমি।

ডলির চোখ দিয়ে জলের রেখা নেমে এলো।

সাধুচরণ বললো, এই বুঁচি, শিগগির যা, মাঠ থেকে তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কবিতা দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমেই ছুটলো।

—সেই জন্যই তো বলছিলুম বউকে তাড়িয়ে দিলেন, এখন বউয়ের সই না পেলে তো কিছু হবে না। তখন আমি অসুখে পড়ে ছিলুম—

—কেন, বউয়ের সই লাগবে কেন?

—সেইটাই নিয়ম।

—ওর বাপ সই করলে হবে না?

—না।

—আমিও নাম লিখতে পারি, সই দিতে জানি। আমি সই দিলেও হবে না?

—বউ নমিনি। বউয়ের নাম লেখা আছে। আইনের চোখে বউই উত্তরাধিকারী।

চোখের জলের ফোঁটা নামতে নামতে থেমে গেল ডলির চিবুকে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইলো পরিমল মাস্টারের দিকে। সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে ধিক্কার, অভিশাপ, ঘৃণা আর হতাশা। এই সবই শহরের

লোকের ষড়যন্ত্র। মনোরঞ্জন তার পেট থেকে বেরোয় নি? তার নাড়িকাটা ধন নয়? তার শরীরের রক্ত জমানো বুকের দুধ খায়নি ছেলেটা? তার গু-মুত কে পরিষ্কার করেছে। নিজে না খেয়ে ডলি কতদিন তার ছেলেকে খাইয়েছে। জন্মদাতা বাপ পাবে না, গর্ভধারিণী মা পাবে না, পাবে একটা পরের বাড়ির অবাগী মেয়ে? আট মাসের বিয়ে করা বউ।

এই অবিচারের জন্য ডলি মনে মনে একমাত্র পরিমল মাস্টারকেই দায়ী করলো।

—মাস্টারবাবু, আপনি এত বড় একটা ক্ষতি করলেন আমাদের?

এবার পরিমলের অবাক হবার পালা। তিনি নিজের উদ্যোগে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন, বারো হাজার টাকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে, তার পরও তার নামে এই অদ্ভুত অভিযোগ।

তিনি বললেন, ও সাধু, কী বলছেন ইনি? আর একটা বিড়ি দে। কিংবা এক প্যাকেট সিগারেট কিনেই নিয়ে আয়, এদিকে পাওয়া যায় না? আচ্ছা থাক, একটু পরে যাস। হ্যাঁ বলুন তো, কী ক্ষতি করলুম আমি?

—টাকা আমরা পাবো না, সে পাবে?

—আহা, হা, সে পাবে মানে কি, আপনারা সকলেই পাবেন। বউকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, সে এখানেই থাকবে আপনাদের সঙ্গে। তার সই না পেলে তো কিছুই হবে না, তারপর টাকাটা পেলে যাতে ভূতে লুটে পুটে না খায়, জমি জায়গা কিনে ঠিক মতন খাটানো যায়, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

এই সময় ছুটতে ছুটতে হাজির হলো বিষ্টুচরণ। উদভ্রান্তের মতন অবস্থা। সে ভেবেছে মাস্টারমশাই বুঝি পকেট বোঝাই করে হাজার হাজার টাকা এনেছেন তাদের দেবার জন্য। বাঘের পেটে মানুষ গেলে যে কেউ টাকা দেয়, সে কথাটা বিষ্টুচরণের কিছুতেই বোধগম্য হবে না। তার মাথায় কেউ হাতুড়ি মেরে বোঝালেও না।

শুধু তো বিষ্টুচরণ নয়, তার পেছনে পেছনে এলো আরও অনেক লোক। মৃত মনোরঞ্জনের বাড়িতে নাকি টাকার হরির লুট হচ্ছে।

সব কিছু নির্ভর করছে একটা এক রত্তি বিধবা মেয়ের ওপর, এই কথাটা কেউ বুঝছে, কেউ বুঝছে না, এই দু দলে লাগিয়ে দিলে তর্ক। এরই মধ্যে নিরাপদ একজনকে 'গাঁড়োলের মতন বুদ্ধি' বলে ফেলায় সে চটে আগুন! তখন দু জনে হাতাহাতি লেগে যাওয়ার উপক্রম। অন্যরা ছাড়িয়ে দিল তাদের।

পরিমল মাস্টার সামনে যাকে পাচ্ছেন তার 'কাছ থেকেই বিড়ি চাইছেন একটা করে। বিড়ি টানতে টানতে এক সময় তিনি উদাসীন হয়ে গেলেন। মনোরঞ্জনের চেহারাটা খুব মনে পড়ছে তাঁর। যেন হঠাৎ সে এক্ষুণি এখানে এসে উপস্থিত হবে।

তিনি বারো হাজার টাকার ব্যাপারটা বলার পর সবাই এমন উত্তেজিত, যেন মনোরঞ্জন মরে গিয়ে ভালো কাজই করেছে।

গ্রুপ ইনসিওরেন্স ব্যাপারটা চালু হয়েছে কবছর মাত্র। এদিককার লোক কেউ জানতোই না। মাস্টারমশাইয়ের কল্যাণে এর আগে তারা জেনেছে জেলেদের কো-অপরাটিভের কথা, চাষের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার কথা, এবার আরো শুনলো বাঘে মানুষ মারার খেসারৎ-এর আজব খবর। মনোরঞ্জনকে মেরেছে বনের বাঘ, তাহলে টাকা কি ঐ বাঘ দিচ্ছে? বাঘ নয়, গভর্নমেণ্ট? মানুষ মরলে গভর্নমেণ্টের কি মাথা ব্যথা? বাঘের বদলে একটা মানুষ যদি আর একটা মানুষকে মারে, তা হলে সেই মরা-মানুষটার পরিবারকে গভর্নমেণ্ট টাকা দেয় না কেন? এসব বোঝা সত্যিই খুব শক্ত নয়?

টাকাটা গভর্নমেণ্ট দিচ্ছে না, দিচ্ছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি? সে আবার কোন দাতাকর্ণ?

হ্যাঁ, গভর্নমেণ্টও দিচ্ছে কিছু। মানুষে মানুষ মারলে গভর্নমেণ্ট কিছু দেয় না বটে, কিন্তু বাঘের অভিভাবক হিসেবে গভর্নমেণ্ট কিছু

দেয়। পরদিন তিনটের লঞ্চে আসা খবরের কাগজে জানা গেল সেই খবর। সুলেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তর মর্মস্পর্শী রচনার গুণের জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক, বিধানসভায় সরকার পক্ষ ঘোষণা করেছেন যে এখন থেকে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-নিহত মানুষের পরিবারকে তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। সরকার শুধু সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের ব্যাপারেই উৎসাহী, সেখানকার মানুষদের কথা চিন্তা করেন না, এটা ঠিক নয়।

তা হলে দাঁড়ালো, বারো আর তিন পনেরো। জ্যান্ত মনোরঞ্জন থুত্থুরে বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও জীবনে কখনও পনেরো হাজার টাকার মুখ দেখতো না।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন বাঘের পেটে গেছে বলে তার বাড়ির লোক পনেরো হাজার টাকা পাবে, এ কথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি মানুষেরও জানতে বাকি রইলো না। দিল্লিতে ষষ্ঠ যোজনায় কত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার থেকে এ সংবাদ অনেক বেশি মূল্যবান এখানে।

গোসাবার কাছে মালোপাড়ার বিধবা পল্লীতে থান কাপড় পরা মেয়ে মানুষরা এ কথা শুনে তাজ্জব। তাদের ঘরের পুরুষরা তো সবাই বাঘের পেটে গেছে, কই, তারা তো এক পয়সাও পায় নি সে জন্য?

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল অধ্যায়

এবার আর মিনমিনে শ্রীনাথকে সঙ্গে আনা হয়নি। নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছে বদ্যিনাথ, আর মাঝ পথে জুটে গেছে ফটিক বাঙ্গাল। এই সেই ফটিক, যার জন্যই হুড়োতাড়া করে মনোরঞ্জনের সঙ্গে বাসনার বিয়ে দিতে হয়েছিল। এই ফটিককে সঙ্গে আনার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না নিতাইচাঁদের, সে এরই মধ্যে বাসনার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করেছে। তবু টাকা পয়সার ব্যাপার, লোকবল থাকা ভালো। বাসনার গয়না উদ্ধার করতে হবে এবং সম্ভব হলে এবারই বেচে দিয়ে যেতে হবে ঐ এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি।

নিতাইচাঁদ ভেবেছে যে ফটিক বাঙ্গালের সঙ্গে বুঝি হঠাৎই দেখা হয়ে গেছে লঞ্চে, কিন্তু ফটিকের জীবনে সব কিছুই হিসেব করা। তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস ফটিকের, এর মধ্যে যে তিনটি বিয়ে করেছে পুরুতের সামনেই। আর বাদ বাকি তো আছেই। দূর দূর গ্রামে সে বিয়ে করে আসে নাম ভাঁড়িয়ে, তারপর এক বছর দেড়-বছর বাদে বউ ছেড়ে পালাতে তার কোনো রকম দ্বিধা থাকে না। মেয়েরা তার কাছে মিষ্টি আখের মতন, যতক্ষণ রস ততক্ষণ সোহাগ, তারপর সারা জীবন ছিবড়ে বয়ে বেড়াবার মতন আহাম্মক সে নয়।

ছিপছিপে ফর্সা মতন চেহারা, চোখ-নাক চোখা, দৃষ্টি সদাই চঞ্চল। ফটিক ছেলেটি প্রতিভাবান, নইলে এত মেয়ে পটাপট পটে কেন তাকে দেখে? কথাবার্তায় অতি তুখোড়। এতদিনের মধ্যে মাত্র একবার হাঁসখালি গ্রামে ধরা পড়ে মার খেয়েছিল সে। সে কি শুয়োর পেটা মার! তারপর তিনমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে

হয়েছিল তাকে। তবু মেয়েধরাই এখনো ফটিকের জীবিকা।

গতকাল দুপুরে পুকুরে স্নান করতে করতে ফটিকের মাথায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল হঠাৎ। এ রকম তার হয়। মাঝে মাঝে সে যেন বাতাসে দৈববাণী শুনতে পায়। বাসনা বিধবা হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে, এ খবর ফটিক পেয়েছে যথাসময়ে। প্রথমে সে ও নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু পুকুরেব কোমব জলে দাঁড়িয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয় নেত্র যেন আচমকা তাকে বলে দিল এই মেয়েটার মধ্যে মধু আছে। ওরে ফটিক লেগে যা।

কয়েকদিন ধরে আড়ালে আড়ালে তক্কে তক্কে থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছে ফটিক। বাসনারা যে আজ এই লঞ্চে যাবে সে আগেই জানে। কিন্তু এক সঙ্গে এলে যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে সেইজন্যই নিজের গ্রাম থেকে না উঠে সে পাটনাখালির কলেজ ঘাট থেকে লঞ্চ ধরেছে। ছাদে, কেবিনঘরের পিছনে ঠেস দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে বাসনা, এক পাশে তার দাদা অন্য পাশে কাকা। ওদের দেখে কত স্বাভাবিক ভাবে চমকে উঠলো ফটিক।

মেয়েদের মন কী করে জয় করতে হয় তা জানাব জন্য ফটিককে ডেল কার্নেগীর বই পড়তে হয়নি। সে ঠিকই জানে যে সদ্য বিধবা মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার মৃত স্বামীর প্রশংসা করা। সহানুভূতি বড় চমৎকার সিঁড়ি, একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

অ-বাঙ্গাল মেয়ের সঙ্গে কক্ষণো বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলে না ফটিক। এ ব্যাপারে সে খুব সতর্ক।

—ভগবানের কি বিচার! আমাদের মতন হেঁজিপেজি অকম্মা লোকদের নেয় না, আমরা বাঁচলেই বা কি, মলেই বা কি, আর নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া, অমন সোন্দর চেহারা, আর কি দরাজ দিল, সেই মানুষটাকে অকালে নিয়ে গেল!

এইভাবে কথা শুরু করে ফটিক। তারপর আকাশের দিকে

তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জীবন অনিত্য, কে কবে আছি কবে নেই…। দুজন মাছের চালানদার এই মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্বটিতে খুব মনোযোগের সঙ্গে সায় দেয়। একজন মন্তব্য করে, যা বলেছেন দাদা, আমাদের বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। বোঝা যায়, বহুদিনের নিষ্ফল অভিমান থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসছে।

—রাজযোটক যাকে বলে। এমন বিয়ে কটা হয়? পাত্রটি যেমন ভালো, তেমন আমাদের গাঁয়ের মেয়েও রূপে-গুণে কিছু কমতি নয়, এরকম মিল সহজে দেখা যায় না। তাও সহ্য হল না ভগবানের?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলা-বউ এর মতন নিথর হয়ে বসে আছে বাসনা। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শুধু। ফটিক তাকে উদ্দেশ্য করে একটানা ঐ ধরনের কথা বলে চললো।

ফটিকের নির্লজ্জতায় নিতাইচাঁদ প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই ছোঁড়াই বাসনাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ইচ্ছে হয় একটা লাথি মেরে ছোঁড়াটাকে নদীতে ফেলে দিতে।

নিতাইচাঁদের দিকেই তাকিয়ে ফটিক এর পরে বললো, কাকা কেমন আছেন? কইখালির নেবারণ দাস আপনার খুব সুনাম কচ্ছিল, আপনি নাকি বিনা সুদে ওকে দুশো টাকা হাওলাৎ দিয়ে অসময়ে বড় বাঁচা বাঁচিয়েছেন।

নিতাইচাঁদকে বাধ্য হয়েই হাসতে হয় একটু। প্রশংসা শুনলে খুশী না হয়ে পারা যায়? নিবারণ দাসের কাছ থেকে সুদ নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো জামিন ধরা হয়নি, সেই জন্য সে সুনাম করেছে?

ফটিক এরপর বদ্যিনাথের দিকে ফিরে বললো, ভূতোদা, তোমার পার্টি নাকি তাসের টুর্নামেন্ট জিতেছে? খেজুরিয়াগঞ্জে খেলতে যাবে? বড় খেলা আছে।

যাদের লোক চরিয়ে খেতে হয় তাদের সবরকম খবরও রাখতে হয়। যে লোকের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছে, তার নাড়ি নক্ষত্রের

সন্ধান জানে ফটিক। বদ্যিনাথ একবার সেখান থেকে একটু উঠে গেলে ফটিক তার জায়গাটায় বসে, বাসনার পাশে।

গাদাগাদি ভিড়ের লঞ্চ। এখন কে কোথায় বসলো তা নিয়ে কোনো কথা চ'লে না। ইঞ্জিনের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দের জন্য কেউ কথা বললে একটু দূরের লোক শুনতে পায় না। ফটিক ফিসফিস করে বাসনাকে বললো, জীবনে এরকম দুঃখ এলে, সে দুঃখ অন্য কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। তবেই না তা সওয়া যায়?

বাসনা ডাগর চোখ মেলে তাকালো ফটিকের দিকে। এই মানুষটির জন্য তাকে একদিন দারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু এর ওপর সে রাগ করতে পারলো না। ফটিকের মুখখানাই এমন যে তাকালে আর রাগ থাকে না। তাছাড়া এত ঝগড়াঝাটির মধ্যে এই একজনমাত্র লোক শুধু কত নরম করে শুধু দুঃখের কথাটাই বললো।

—মনোরঞ্জনের ছবি আছে তোমার কাছে?

—ছবি?

—ফটো তুলে রাখোনি এক সঙ্গে? গোসাবায় তো পাঁচ টাকায় ফটো তুলে দেয়। ইস কী নিয়ে কাটাবে সারা জীবন!

কোনোরকম স্বার্থের গন্ধ নেই ফটিকের মধ্যে। একটি নীতিতে ফটিক সব সময় অটল থাকে। ধীরে বন্ধু, ধীরে।

এক সময় গলা খাঁকারি দিয়ে নিতাইচাঁদ জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইদিকে কোথায় যাচ্ছো ফটিক?

—আজ্ঞে কাকা, আমি যাচ্ছি নাজনেখালি, সেখানে আমার এক মাসীর বাড়ি—

—তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে···বাসনার শ্বশুর বাড়িতে একটু গোলমাল কচ্ছে, তুমি আমাদের গাঁয়ের ছেলে, পাশে একটু দাঁড়াবে—

নিশ্চয়ই। ফটিক তো তাই-ই চায়। লঞ্চে সে কি হাওয়া খাওয়ার

জন্য উঠেছে? তার মাসীর বাড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়ানো।

বাসনার যেন কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। সে কোথায় থাকবে কোথায় যাবে, তা সে নিজে ঠিক করতে পারে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, চলে এলো বাপের বাড়ি, আবার বাপের বাড়ির লোকই তাকে নিয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ি। সেখানে গেলে যে আবার কী কুরুক্ষেত্র শুরু হবে, তা ভাবলেই বাসনার রক্ত হিম হয়ে যায়। তার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। ও বাড়ির পেছনের একটুখানি জমিতে বেগুন গাছে ফুল দেখে এসেছিল বাসনা। এখন সেখানে নিশ্চয়ই কচি কচি বেগুন ফলেছে। মনোরঞ্জন নিজের হাতে ঐ বেগুনের ক্ষেত করেছিল। বাসনা সেদিকে কী করে তাকাবে? ধানের গোলা, ঝিঙের মাচা, সব কিছুতেই মনোরঞ্জনের হাতের ছাপ।

নাজনেখালি এসে গিয়েছে বলে কিছু লোক উঠে দাঁড়াতেই বাসনার বুকের মধ্যে ঢুপ ঢুপ করে উঠলো। এই জায়গাটার নাম শুনলেই তার এরকম হচ্ছে কদিন ধরে। বিয়ের আগে সে নাজনেখালির নামই শোনে নি।

জেটি ঘাটায় নামতেই বোকা নগেন দাসের সঙ্গে দেখা।

প্রত্যেকদিন এই সময়ে নগেন দাস এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো দিন লঞ্চে উঠে কোথাও যায় না, তার কাছে কেউ আসে না, তবু এই একটা নেশা। এই লঞ্চের মানুষজনের ওঠা-নামা দেখাই তার কাছে এক ঝলক বাইরের পৃথিবী দেখা।

নিতাইচাঁদকে সে নিজেই ডেকে বললো, ও মশাই, আবার এসেছেন? ভালো করেছেন। খবর শুনেছেন তো?

আর একজন লোক বললো, এই তো মনোরঞ্জন খাঁড়ার বউ ফিরে এয়েছে।

অন্য একজন বললো, তাহলে আর চিন্তা নাই, বিষ্টু খাঁড়ার কপালডা ফিরা গ্যাল এবার।

ভুরু দুটো নেচে উঠলো নিতাইচাঁদের। কী ব্যাপার? এরা কী বলতে চায়?

দু পা বাড়ালেই মোচা বিষ্টুর চায়ের দোকান। সেখানে এসে চায়ের অর্ডার দিল ফটিক। একদল লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাসনাকে বসানো হলো বাণী কাঠের তক্তার বেঞ্চে।

—আপনে শোনেন নাই, মনোরঞ্জনের বউয়ের নামে ভারত সরকার আর বাংলা সরকার পনেরো হাজার টাকা দেবে?

—সাহেবরাও আরও কিছু দিতে পারে শুনছি।

—আমেরিকা দিলে রাশিয়াও দেবে।

—দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ওর হাতে প্রাইজ দেবে না?

একটা হাসির রোল পড়ে যায়। মনোরঞ্জন খাঁড়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ একটা রসিকতা জমে উঠেছে। বাঘে মারলে পনেরো হাজার টাকা। তুমি জলে ডুবে মরো, কেউ তোমায় পাত্তা দেবে না। তুমি যদি ওলাউঠোয় মরলে তো মরলে, ব্যাস, ফুরিয়ে গেল! এমন কি, তোমায় পাগলা কুকুরে কামড়াক কিংবা জাত সাপে কাটুক, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু বাঘে তোমার ঘাড় ভেঙে দিলেই পনেরো হাজারটি কড়কড়ে টাকা পেয়ে যাবে। গভর্নমেণ্ট দেবে। চমৎকার ব্যাপার না?

নিতাইচাঁদ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। পনেরো হাজার টাকা কাকে বলে এরা জানে? ঐ মেয়ে এত টাকা পাবে কেন!

ফটিকের বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলছে। তার মন বলেছিল না, এই মেয়ের মধ্যে মধু আছে? পনেরো হাজার টাকা! দেখা যাক ঐ টাকা কে পায়। তার নাম ফটিক লস্কর।

নদীর ধারের বাঁধের ওপর দিয়ে দলে দলে লোক আসছে বাসনাকে দেখবার জন্য। আজ হাটবার, এমনিতেই অনেক লোক আসতে শুরু করে এখন থেকেই

রীতিমতন ভিড় জমে গেল বাসনাকে ঘিরে। আর সেই সঙ্গে নানা রকম গুঞ্জন। মনোরঞ্জন খাঁড়ার বিধবা বউ এখন দারুণ এক দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এক গলা ঘোমটা টেনে ঐ যে পুঁটুলিটি বসে আছে, তার হাতের একটা সই-এর দাম এখানকার সকলের চেয়ে বেশী।

ফটিক নিতাইচাঁদের কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বললো, কাকা একটু শোনেন।

তারপর ভিড়ের জটলা থেকে নিতাইচাঁদকে খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে দারুণ উত্তেজিতভাবে বললো, কাকা, ব্যাপারটা বোঝলেন নি? আপনাগো মাইয়া এখানে আনছেন, সব টাকা তো অরা লইয়া যাবে।

নিতাইচাঁদ বললো, কার টাকা? কিসের টাকা বলো তো?

—ঐ যে শোনলেন না? মনোরঞ্জনরে বাঘে খাইছে সেই জইন্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। অনেক টাকা। ক্ষতি কার আপনাগো না?

এমন যে ধুরন্ধব নিতাইচাঁদ, তারও বিষয়টা মাথায় ঢুকছে না এখনো। ফটিক অতি দ্রুত বুঝিয়ে দিল।

—তা হলে এখন উপায়?

—কাকা, এই ফটিক বাঙ্গালের পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে আমি কই, চলেন এখনি আমরা ফিরা যাই।

—ফিরে যাবো?

—বাসনারে একবার শ্বশুরবাড়ি লইয়া গ্যালে হ্যারা আর ছাড়বে অরে? বাসনারে দিয়া সই-সাবুদ করাইয়া সব টাকা অরা হজম কইরা দেবে না?

—টাকা…ওরা নেবে?

—নেবে না? একবার বাসনার সই পাইলেই হয়।

—তাহলে এখন উপায়?

—চলেন, এক্ষুণি ফিরা যাই। মনোরঞ্জনের বাবা আইস্যা কইলেও

আপনে বাসনারে ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাডবেন না। আমাগো গ্রামের মেয়ে, আমাগো গ্রামেই থাকবে।

—লঞ্চ ছেড়ে গেল…এখন আমরা ফিরবো কী করে?

—সে ব্যবস্থা আমার, আপনে যান বাস্‌নার হাত ধইরা থাকেন, অগো সাথে কথা কইয়া সময় কাটান গিয়া একটু……

সত্যিই করিৎকর্মা ছেলে বটে ফটিক। হাটবার বলে অনেক নৌকো এসে লেগেছে আজ। তারই মধ্যে একটি নৌকোব মাঝির সঙ্গে দরাদরি কবে ঠিক করে ফেললো সে।

তাবপর ছুটে এসে বললো, কাকা চলেন।

বদ্যিনাথ কিছু বুঝতে পারেনি। সে বলতে লাগলো, কোথায়? কোথায়? মনোরঞ্জনদের বাড়ি তো এদিকে।

—আগে একবার জয়মণিপুরে যেতে হবে…শিগ্‌গির।

ওদের দলটি আবার জেটি ঘাটের দিকে ফিরে যেতেই ভিড়ের একজন বললো, একি, ওরা চলে যায় যে।

—বিষ্টুরা কোনো খবর পেলো না।

—অবাক কাণ্ড, এখনো চিতের ধোঁ উড়লো না, আর বউ ড্যাংডেঙ্গিয়ে চললো বাপের বাড়ি।

—আবার এলোই বা কেন, ফিরে চললোই বা কেন?

মাঝপথে খেলা ভেঙে যেতে মজাটা যেন জমলো না। সদ্য বিধবা বউ, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে এসে লঞ্চঘাটে পা দিয়েই ফিরে যাচ্ছে, এ কেমন ধারা ব্যাপার। দু চারজন চলে গেল মনোরঞ্জনের বাপ-মাকে খবর দিতে।

ফটিক নিজে বাসনার হাত ধরে তুললো নৌকোয়। নিতাইচাঁদ কেমন যেন হ্যাবড়াজোবড়া হয়ে গেছে। নৌকোর দড়ি খুলে মাঝিকে তাড়া দিয়ে ফটিক বললো, আরে ভাই, ছাড়েন। ছাড়েন।

ভাটার সময়। তবু নাজনেখালি থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হৈ হৈ করে এসে গেল সাধুচরণের দল। ভিড় ঠেলে এসে জেটি ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করতে লাগলো।

—মাধবদা, তোমার চোখের সুমুখ দিয়ে মনোরঞ্জনের বৌকে নিয়ে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে না?

মাধব একমনে গাঢ় নীল রঙের নাইলনের জাল ধুয়ে পরিষ্কার করছিল, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত দুটি চোখ তুলে সে তাকালো ওদের দিকে। ওরা আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে, মাধব চুপ।

তারপর হঠাৎ সে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, তা আমি কি করুম? পরের বউ লইয়া টানাটানি করুম?

—তা বলে আমাদের গাঁয়ের বউকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে?

—যার যা ইচ্ছা করুক।

প্রথমে প্রায় লাফিয়ে পড়লো নিরাপদ, তারপর সাধুচরণ, সুশীল, বিদ্যুৎ, সুভাষ সবাই নেমে এলো নৌকোর ওপরে। মাধব হা হা করে উঠলেও কেউ গ্রাহ্য করলো না। উত্তেজনায় ওদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। গ্রামের ইজ্জৎ বলে কথা। আশপাশের কয়েকখানা নৌকো থেকে তারা চেয়ে নিল কয়েকটা দাঁড়, সবাই ঝপাঝপ হাত চালালো একসঙ্গে।

ফটিক, নিতাইচাঁদ পেছন দিকে তাকিয়েই ছিল, ওরা এক নজর দেখেই বুঝতে পারলো একখানা নৌকো তেড়ে আসছে ওদের দিকে। ফটিক চেঁচিয়ে উঠলো, হাত চালাও, ও দাদা, হাত চালাও। আমাদের যেন ধরতে না পারে।

তারপর শুরু হলো নৌকো বাইচ।

কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের দুর্দান্ত মেম্বারদের সঙ্গে পারবে কেন মামুদপুরের লোকেরা। নিতাইচাঁদ আর বদ্যিনাথ দুজনেই বাবু ধরনের, তারা নৌকোর দাঁড় ধরতে জানে না।

মাধবের নৌকো একেবারে ঠকাস করে লাগলো নিতাইচাঁদের ভাড়া নৌকোর গায়ে। সাধুচরণ আগেই ঝুঁকে ছিল, খপ করে চেপে ধরলো বাসনার হাত।

নিতাইচাঁদ বললো, এই, এই, আমাদের মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।

নিরাপদ বললো, শালা, চোর, আমাদের গেরামের বউকে চুরি করে পালাচ্ছো!

দু দলই হাতের দাঁড়গুলো উঁচু করে তুলেছে, এই বুঝি কাজিয়া বাধে।

সাধুচরণ বাসনার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই উল্টে গেল নিতাইচাঁদদের নৌকোটা। বেগতিক বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তেই ফটিক জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

অত্যন্ত কেরামতির সঙ্গে নিজের নৌকোটা সামলে আছে মাধব। এই সব ব্যাপারটিতেই সে বিরক্ত। সে সংসারী লোক, তাকে আবার জড়িয়ে পড়তে হলো ঝঞ্ঝাটে। সে চ্যাঁচাতে লাগলো, আরে বইস্যে পড়, বইস্যে পড় হারামজাদারা, এডারেও উল্টাবি।

এত বড় একখানা নদীতে কেউ কোনো দিন সাধ করে একবারও ডুব দেয় না। ঘাটের কাছেও স্নানে নামে না। এমন কামটের উৎপাত। সেই নদীর জলে এতগুলো মানুষ। বাসনার হাত ছাড়েনি সাধুচরণ, তাকে ডুবতে দেয়নি। নিতাইচাঁদকেও টেনে তুললো সুভাষ আর বিদ্যুৎ। বদ্যিনাথ কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেল। মাঝি দুজন অনেক কষ্টে আবার ভাসিয়ে তুললো তাদের নৌকোটাকে।

শুধু তলিয়ে গেল ফটিক, তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তবে, সত্যি সত্যিই কি আর তলিয়ে যাবে? বাঙাল দেশের ছেলে, ওরা নাকি জলের পোকা হয়, ভুস্ করে আবার কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ঠিকই।

ধুতির কাছা-কোঁচা খুলে গেছে, নিতাইচাঁদের মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে, ত্রিভঙ্গ মুরারির মতন দাঁড়িয়ে তড়পাতে লাগলো, আমি থানায় যাবো...জুলুমবাজি···একি মগের মুলুক···তোদের সব কটার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলের ঘানি যদি ঘুরোতে না পারি···আমার নাম নিতাইচাঁদ সাধু নয়। দিন দুপুরে ডাকাতি...মেয়েছেলের গায়ে হাত...আমি ছাড়বো না। সব কটাকে আমি...।

সেয়ানে-সেয়ানে

এবার দারোগার কথা।

গৌর হালদার নিছক এক রঙা মানুষ নয়। ধপধপে সাদা বা কুচকুচে কালো রং দিয়ে তার চরিত্র আঁকা যাবে না নিছক সত্যের খাতিরেই।

সচরাচর মফঃস্বলের মাঝবয়েসী দারোগাদের মতন গৌর হালদারের পেট মোটা চেহারা নয়, বেশ লম্বা, বলশালী শরীর, গায়ের রং শ্যামলা, মুখটা অনেকটা মঙ্গোলীয় ধরনের, চোখ ছোট এবং কম কথা বলা স্বভাব। থানার বাইরে বেরোতে না হলে তিনি ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরে থাকেন।

কেউ বলে, ওরে বাপরে, এমন চশমখোর লোক আর হয় না। সেই যে যতীন ঘোষাল দারোগা ছিল কাঁচা রক্ত খেগো দেবতা, বছর দশেক আগে যার ভয়ে এ তল্লাটের মানুষ ভয়ে কাঁপতো, সবাই ভেবেছিল এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর হয় না। এই গৌর হালদার যেন তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর এই দারোগা ছুঁলে ছাপ্পান্ন ঘা! আবার কেউ বলে, গৌর দারোগা যেন ঝুনো ডাব, বাইরে শক্ত কিন্তু ভিতরে দয়া-মায়া আছে। কেউ বলে, পয়সা চেনে বটে গৌর দারোগা। পিঁপড়ের পেছন টিপে মধু বার করতে জানে। আবার কেউ বলে, শুধু হাতে থানায় গেলাম, বড়বাবু কথা শুনলেন, ঠারে-ঠোরেও পয়সা চাইলেন না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে গেল। এমনটি আগে কখনো দেখিওনি, শুনিওনি।

একই মানুষ সম্পর্কে এমন পরস্পর বিরোধী কথা শোনা যায় কী করে? এ কোন্ রহস্য?

রহস্যটি আসলে সরল।

এই বাদা অঞ্চলে মোটমাট চার রকমের মানুষ। বন কেটে বসতির সময় একদল এসেছে উড়িষ্যা থেকে, একদল এসেছে মেদিনীপুর থেকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আগেও এসেছে, পরেও এসেছে, আর এসেছে মুসলমান। এই চার রকমের মানুষ এতদিনেও একসঙ্গে মিশে যায়নি, এদের আলাদা পাড়া ও অস্তিত্ব আছে। উড়িষ্যার লোকেরা সবাই এখন খাঁটি বাংলায় কথা বললেও নিজস্ব সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলেনি। আর মুসলমানদের সবাইকেই এখানে অন্যরা বলে মোল্লা।

গৌর হালদারের পক্ষপাতিত্ব আছে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতি। ইনিও পার্টিশানের পরে আসা রিফিউজি। যাদবপুরের কলোনিতে জল-কাদা, নোংরা, মশা-মাছি, লাঞ্ছনা, অপমান ও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। তারপর ভাগ্যচক্রে পুলিসে কাজ পেয়েছেন। এবার তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। তিনি যে শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঘোর সাপোর্টার তাই নন, পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের তিনি ঘোরতর অপছন্দ করেন। যাদবপুরে থাকবার সময় ছাত্রাবস্থায় খেলার মাঠে তিনি মোহনবাগানের দর্শক গ্যালারির দিকে নিয়মিত ইঁট মারতেন, হাত-বোমাও ছুঁড়েছেন কয়েকবার।

গৌর হালদার শুধু বাঙাল নন। বাঙালদের মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদাভেদ মানেন তিনি। তাঁর জন্ম টাঙ্গাইলে, তিনি মনে করেন টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা. রাজসাহী নিয়ে যে একটি বৃত্ত, এখানকার মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ফরিদপুর-যশোর-খুলনার বাঙালরাও ঠিক বাঙাল হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্পর্শে আগে থেকেই ওদের খানিকটা চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নিছক বাঙাল নামের জন্যই ওরা খানিকটা সহানুভূতি পাবার যোগ্য।

ওড়িয়া, মুসলমান এবং কিছু কিছু সাঁওতালও যে আছে বাদা অঞ্চলে, তাদের প্রতি গৌর হালদারের তেমন কোনো বিদ্বেষ নেই,

তাঁরা বিপদে পড়লে তিনি সাধ্য মতন সাহায্য করেন। তার সমস্ত রাগ শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের ওপর। বিশেষত কলকাতা শহর থেকে যেসব জমির মালিক বা ভেড়ির মালিক মাঝে মাঝে এখানে আসে টাকা নিয়ে যাবার জন্য, তাদের কোনোক্রমে বাগে পেলে গৌর হালদার একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেন। অনেক সময় আইনের পরোয়া না করে বে-আইনীভাবেও তাদের নির্যাতন বা হয়রান করেন কিংবা অর্থদণ্ড ঘটান। টাঙ্গাইলের ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি, পুকুর, ধান জমি সব ছেড়ে অসহায়ভাবে চলে এসেছেন এক-সময়, তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাস করেছে, যাদবপুরের জলাভূমিতে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন ঘরে থাকতে দিয়েছে। সে রাগ তিনি কখনো ভুলতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি প্রায় একটি গুপ্ত-উন্মাদ।

মরিচঝাঁপির দ্বীপ থেকে যখন বাঙালখেদা অভিযান হয়, সেবার শোকে-দুঃখে রাগে-অভিমানে গৌর হালদার তিন মাসের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থেকে অসহায় ভাবে হাত কামড়েছেন। নিজে সরকারি কর্মচারি বলে তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে প্রতিশোধ কামনার আগুন। তারপর আবার কাজে যোগ দিয়েই তিনি অ-বাঙাল হিন্দুদের উপর বাড়িয়ে দিয়েছেন অত্যাচারের মাত্রা। অবশ্য, এসবই গৌর হালদারের মনে মনে। বাইরে কিছু প্রকাশ করেন না। বিশেষ এক ধরনের মানুষের ওপরেই যে গৌর হালদারের রাগ, তা তিনি কক্ষণো বুঝতে দেন না, তাদের সঙ্গেও কথা বলেন হাসি মুখে। তিনি সকলের সামনে এক রকম, আবার বাড়ির মধ্যে অন্য মানুষ। গৌর হালদারের ছেলে মেয়েরা যারা জীবনে কখনো পূর্ব বাংলায় যায়নি, তারাও যদি বাড়িতে কখনো বাঙাল ভাষা না বলে ঘটি-ভাষা বলে ফেলে, অমনি গৌর হালদার কানচাপাটি বিরাশি শিক্কা থাবড়া মারেন তাদের। বাইরে যত ইচ্ছে ঘটি ভাষা বলুক, বাড়িতে চলবে না।

নাজনেখালির বাঘে-খাওয়া মনোরঞ্জনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই কানে এসেছে গৌর হালদারের। জয়মণিপুরের সব ব্যাপারে নাক গলানো ইস্কুল মাস্টারনীটির হাতে লেখা একটি দরখাস্তও তাঁর কাছে এসেছে, তিনি চুপচাপ চেপে বসে আছেন। ওরা ভেবেছে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। গৌর হালদারের সঙ্গে একটিবার দেখা করারও দরকার নেই, না? আচ্ছা।

নিতাইচাঁদ গৌর হালদারের কাছে এসে সুবিধে করতে পারলো না। দারোগাবাবুর মন ভেজানোর জন্য সে অনেক রকম কাঁদুনি গাইলো। সব কথা শুনে ডায়েরি না লিখেই গৌর হালদার হাঁকিয়ে দিলেন নিতাইচাঁদকে। ছেলের বউকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিজেদের কাছে রাখতে চায়, এতে আবার নারী-হরণ কী? বেয়াইতে বেয়াইতে কোঁদল, এর মধ্যে পুলিস নাক গলাতে যাবে কেন? নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে? তা সে নৌকোর মাঝি কোথায়? তাকে ডাকো, কেস লেখাতে হয় সে লেখাবে।

ভাড়া নৌকোর মাঝির বয়েই গেছে থানায় আসতে। সুখে থাকতে সাধ করে কে ভূতের কিল খেতে যাবে।

নিতাইচাঁদ আরও অনেকভাবে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো বাসনাকে। দু চারটে লোক লাগালো। যদি হাটবারে ভিড়ে গণ্ডগোলে কোনো রকমে ফুসলে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ্ ক্লাবের সদস্যদের কড়া পাহারায় তা হবার উপায় নেই। থানাতে ঘোরাঘুরি করেও কোনো সুরাহা হলো না। শেষ পর্যন্ত নিতাইচাঁদ হাল ছেড়ে দিল।

এরপর একদিন থানায় এলো সাধুচরণ। পরিমল মাস্টার পাঠিয়েছেন। এই সাধুচরণকে গৌর হালদারই জেলে পাঠিয়েছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গৌর হালদার বললেন, কী রে, আবার জেলের ভাত খাবার শখ হয়েছে বুঝি? ধান কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আবার তোকে পাঠাবো।

সাধুচরণ বললো, মাস্টারমশাই বললেন...

—তোদের মাস্টারমশাই কোন্ লাট সাহেব? নিজে আসতে পারে না?

বাসনার সই পাবার পর ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থাটা অনেক পাকা হয়ে গেছে। চিঠি লেখালেখি হয়েছে সরকারের সঙ্গে। এখন দরকার শুধু থানার রিপোর্ট।

অতএব পরিমল মাস্টারকেই সশরীরে আসতে হলো একদিন।

গৌর হালদার সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন, মাস্টারমশাই, আসুন। ওরে একটা চেয়ার দে। চা খাবেন তো? নাকি ডাব খাবেন? আমাদের থানার কম্পাউণ্ডে বড় বড় পাঁচটা নারকোল গাছ···

শুধু মাস্টারমশাই তো নন্, সোস্যাল ওয়ার্কার, অনেক টাকার প্রজেক্ট চালাচ্ছেন, এঁদের একটু খাতির দেখাতেই হয়। দু চারজন মন্ত্রীটন্ত্রীর সঙ্গে চেনা থাকে এঁদের। হুটহাট করে হোম সেক্রেটারি কিংবা চীফ মিনিস্টারের পি এ বেড়াতে আসেন এঁদের কাছে।

গৌর হালদার নিজে একটা চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে দিলেন পরিমল মাস্টারকে। একই সঙ্গে চা আনাবার জন্য এবং ডাব পাড়বার জন্য হাঁক ডাক করতে লাগলেন জমাদারদের। বিশিষ্ট অতিথির প্রতি সম্মান জানাতে গৌর হালদারের যেন কোনো কার্পণ্য নেই।

টেবিলের দুপাশে দুজন মুখোমুখি বসবার পর গৌর হালদার তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটির তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করলেন। এই পরিমল মাস্টারের মতন লোকরাই তাঁর এক নম্বরের শত্রু। শহরের লোক। নেহাৎ ভাগ্যগুণে পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে বলেই সারা জীবন পাকাবাড়িতে থেকেছে, ছেলেবেলায় ঠিকঠাক শিক্ষা পেয়েছে, হাত-খরচের পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, পার্কে কিংবা গড়ের মাঠে প্রেম করেছে মার্জিত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, আর কোনো না কোনো-

দিন মুখ বেঁকিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, এই রিফিউজিগুলোর জন্যই এমন সুন্দর কলকাতা শহরটা দেখতে দেখতে একেবারে যা-তা হয়ে গেল।

অথচ গৌর হালদার তো প্রায় একই রকম পরিবারের সন্তান, তাঁদেরও পাকা বাড়ি ছিল, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ আর জমিতে ধান ছিল। সে সব কিছু থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে থাকতে হয়েছে শহরতলীর বস্তিতে। ক্যাশ ডোলের জন্য সরকারি অফিসারদের পা ধরতে হয়েছে, ঘুষ দিতে হয়েছে, এমন ইস্কুলে পড়তে হয়েছে, যেখানে পড়াশুনো কিছু হয় না, কলেজে পরীক্ষার সময় ফি জোগাড় করতে না পেরে ভিক্ষে করতে হয়েছে বড়লোকদের কাছে, অভাবের তাড়নায় বাড়ির একটা মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বেশ্যা হয়েছে···এসব কার দোষে?

—তা গৌরবাবু, কেমন আছেন? ভালো আছেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মাঝে খুব জ্বর হয়েছিল শুনলাম।

—সে খবরও পেয়েছেন। আপনারা পুলিসের লোক, সব খবর রাখেন।

—আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব খবর এ তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ে। আপনার ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছে?

—এখনো সিলেকশান হয়নি···তা গৌরবাবু, এসেছিলুম একটা বিশেষ কাজে।

—কাজ ছাড়া আর কেন আসবেন! আমাদের যত চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার, আপনাদের মতন মানী লোকের পায়ের ধুলো তো সহজে পড়ে না। আপনাদের ওখানে অ্যানুয়াল ফাংকশান কবে হচ্ছে এবারে?

—এই সামনের মাসে। আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

—যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

—আপনার কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে। একটা ক্লেইম কেসের ব্যাপারে—

—বলুন। আপনি নিজে এলেন কেন, লোক পাঠালে হতো।

—নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া নামে একটি ছেলে…

গৌর হালদার উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে খোঁজাখুঁজি করে একটা ফাইল নিয়ে এলেন, সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়বার ভান করলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না।

একবার মুখ তুলে বললেন, নিন, চা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভাবের জল আসছে।

তারপর একটু বাদে তিনি আবার বললেন, হঁ্যা, আপনার স্ত্রীর পাঠানো একটা দরখাস্ত রয়েছে দেখছি।

—ফরচুনেটলি, বুঝলেন গৌরবাবু, ওদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করানো ছিল, ওর বাড়ির লোক…

—বাঃ, তবে তো ভালোই।

—সরকারও এই সব কেসে কিছু টাকা দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

—হ্যাঁ, আমার কাছে সার্কুলার এসেছে।

—এখন আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলেই…

—কোন্ ফরেস্টে গিয়েছিল বললেন?

—তিন নম্বর ব্লকে।

—আমায় বিশ্বাস করতে বলেন?

দু জনে চোখাচোখি হলো। বুদ্ধির লড়াই এবার আসন্ন।

পরিমল মাস্টার জানেন, এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজে হাত দিলে কোনোটাই ঠিক মতন হয় না। স্থানীয় ও সি যদি ঘুষখোর হয়, ফরেস্টবাবু যদি হয় অত্যাচারী, কোনো ব্যবসায়ী হয় অসাধু, এদের সবাইকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা সব অভিযোগের প্রতিকার করার সাধ্য তাঁর নেই। মাত্র কাছাকাছি দশখানা গ্রাম নিয়ে তাঁদের প্রজেক্ট। ভূমিহীন কিংবা সামান্য জমির মালিক চাষীদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করাই আপাতত তাঁর কাজ।

এইটুকু হলেই যথেষ্ট। এইটুকু নয়, এটাই বিরাট ব্যাপার।

ও সি গৌর হালদারের ভালো আর মন্দ দু রকম ব্যবহারের কথাই শুনেছেন পরিমল। লোকটির চরিত্রের বৈপরীত্যের ব্যাপারটা তিনি বুঝেছেন, যদিও আসল কারণটা জানেন না। এবং এ লোকটিকে তিনি ঘাঁটাতেও চাননি, তাঁর কাজে বাধা না দিলেই হলো।

—ফরেস্টের জয়নন্দনবাবু ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।

—কোথায় ঘুরে এসেছেন? সে রিপোর্টের কপি তো আমি পাই নি?

—উনি তিন নম্বর ব্লকে গিয়েছিলেন···রাইটার্স বিল্ডিংসে নোট পাঠিয়েছেন শুনেছি।

—রাইটার্স বিল্ডিংস? ও! তা তিনি তিন নম্বর ব্লকে ঘুরে কী দেখলেন? সেখানে বাঘ আছে, না নেই? সেখানে বাঘের কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

—না, বাঘের কোনো প্রমাণ পাননি। তারপর কটা জোয়ার ভাটা গেছে, বৃষ্টিও পড়েছে···

—জয়নন্দনবাবু তিন নম্বর ব্লকে বাঘের কোনো প্রমাণ দেখতে পেলেন না, পাবার কথাও নয়, সেখানে বাঘ কেন, একটা শেয়ালও নেই, আর সেখানে একটা তাগড়া লোক বাঘের পেটে চলে গেল?

—দয়াপুরে যে বাঘ এসেছিল, কোনোদিন কি কেউ ভেবেছে যে দয়াপুরে বাঘ আসতে পারে?

—না, কেউ ভাবেনি। যেখানে বাঘ নেই, সেখানে বাঘ এসেছে শুনলেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তবে দয়াপুরের বাঘটিকে অনেক লোক চোখে দেখেছে, একটি ছোট মেয়েকে বাঘটা মেরেছে, আমি গিয়ে সেই মেয়েটির লাশ দেখেছি, তারপর বিশ্বাস করেছি।

—ওখানেও অনেক দেখেছে।

—আপনি নিজে লাশ দেখেছেন?

—না।

—জয়নন্দন ঘোষাল বা অন্য কেউ সে লাশ দেখেছে ?

—তা ঠিক জানি না···বোধহয় লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

—লাশটা কোথায় গেল ? আমি তো যতদূব জানি, বাঘ যাকে ধরে, তাব সবটা খায না, দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার মাংস খেয়ে চলে যায়। লোকটার জামা কাপড়ই বা গেল কোথায় ?

—গেঞ্জিটা পাওয়া গেছে।

—বটে ? শুধু গেঞ্জি ?

– তাই তো শুনেছি।

—সেটা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠাতে হবে না ? আমি তো দেখিনি সে গেঞ্জি।

—তা হলে গেঞ্জিটা চেয়ে পাঠাতে হয়. আবাব অনেক দেবি হয়ে যাবে

—দেবি ? হ্যাঁ, তা দেব তো হবেই ? মনোরঞ্জন খাঁড়ার বাড়িতে কে কে আছে ? তার বউ আছে না ?

—হ্যাঁ, একেবারে কচি মেয়ে, সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে।

—তাকে আনা হয়নি ?

—তাকে কি থানায় আনাব খুব দরকার ? এখন শোকের সময়।

—ছেলেটার বাপ কোথায় ? সেও আসে নি। শুধু আপনি এসেছেন তদ্বিব করতে ? বুঝলাম।

—আপনার রিপোর্টের ওপরই সব নির্ভর করছে। আপনি ফেভারেবল রিপোর্ট দিলেই বিধবা মেয়েটা আর ঐ ছেলেটার বাপ-মা টাকা পেতে পারে।

অর্থাৎ আর বুদ্ধির খেলা নয়, এবার হৃদয়ের কাছে আবেদন।

একটা সিগারেট টানাব জন্য মুখ শুল শুল করছে পরিমল মাস্টারের। চারদিন একটাও সিগারেট খাননি, তবু নেশাটা কিছুতে ছাড়ে না। এই রকম সময়ে সিগারেট খুব বেশী প্রয়োজন হয়।

গৌর হালদার বিড়ি-সিগারেট কিছু খান না। পাশের টেবিলে

সাব ইন্সপেক্টর অবিনাশ ফুঁক ফুঁক করে একটা সিগারেট টানছে। সেই ধোঁয়াতেই আরও আনচান করছে পরিমল মাস্টারের মন। অথচ মুখ ফুটে চাওয়াও যায় না। অবিনাশের সামনের চেয়ারে বসে আছে দুটি বাইরের ছোকরা। ওরা বন-বাণী নামে চার পৃষ্ঠার একটি নিউজ প্রিন্টে ছাপা পত্রিকা বার করে। কান খাড়া করে ওরা শুনছে সব কথা।

—ঘটনাটা ঘটলো কবে যেন, আট তারিখে। আর আমার কাছে একখানা শুধু দরখাস্ত পৌঁছোলো সতেরো তারিখে। অথচ এর মধ্যে থানায় একটা রিপোর্ট নয়, কিছু না। আমায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলে আমি সরেজমিনে দেখে আসতে পারতাম না?

সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পরিমল মাস্টার এবার বিনীত ভাবে বললেন, সত্যিই, আপনাকে আরও অনেক আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এটা ভুল হয়ে গেছে খুবই, আর একটা ব্যাপার হলো কি জানেন, আমিও তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম—

গৌর হালদার আবার চোখ কুঁচকোলেন। অর্থাৎ পরিমল মাস্টার বলতে চায় ওর অসুখ না থাকলেই ও সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে দিত। সব দায়িত্ব ওর, ও একাই সব গরিবদের মহান মুক্তিদাতা। কত দরদ! মরিচঝাঁপির অসহায় লোকগুলোর ঘর জ্বালিয়ে যখন মেরে তাড়ানো হলো, তখন এই দরদ কোথায় ছিল পরিমল মাস্টারের? এরা শুধু নিজের লোকদের স্বার্থ দেখে।

—আচ্ছা ধরুন, মাস্টারমশাই, কোনো লোক যদি বলে, সে মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বসিরহাট বাজারে দেখেছে?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন পরিমল, চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললেন?

—ধরুন, কেউ যদি বলে ঐ ছেলেটাকে কেউ বসিরহাট বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তা হলে কী হবে? জঙ্গলে যাবার নাম করে কেউ যদি কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে

থাকে, আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ে দেয় যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে? আমি লাশ দেখলাম না, কিছু না, টাইগার-ভিকটিম বলে রিপোর্ট দিয়ে দিলাম, তারপর সে লোক সত্যি না মরলে আমার চাকরি থাকবে?

পরিমল মাস্টার স্তম্ভিত ভাবে বললেন, তা কখনো হয়?

বন-বাণী পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় গৌর হালদারের এই শেষের যুক্তিটা লুফে নিল। অবিকল সেই কথাগুলিই ছাপা হলো তাদের কাগজে। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে নাকি বসিরহাট বাজারে দেখা গেছে? কে দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই কেউ, নইলে দারোগাবাবু ও কথা বলবেন কেন?

থানার রিপোর্ট না পেয়ে ইনসিওরেন্স দপ্তর বেগড়বাঁই করতে লাগলো। সরকারি বিভাগও চুপচাপ। অনেক চেষ্টা করেও ও সি গৌর হালদারকে নড়ানো গেল না। পরিমল মাস্টারও মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে আছেন। তিনি জানেন তিন নম্বর ব্লক আর সাত নম্বর ব্লক জঙ্গলের তফাৎ। সত্যি কথাটা বলে দেওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষেও।

গৌর হালদারের সঙ্গে তর্ক করার মতন জোরালো যুক্তি তাঁর মনে পড়লো না একটাও।

কয়েক দিন পরেই আর একটি চমকপ্রদ কাণ্ড হলো।

রায়মঙ্গল নদীতে এক সঙ্গে বাপ আর ছেলেকে আক্রমণ করেছে বাঘে। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নৌকো বেঁধে ঘুমোচ্ছিল ওরা। বাঘ এসেছে সাঁতরে। অন্তত সাত বছরের মধ্যেও ও তল্লাটে বাঘের এমন উপদ্রব হয়নি। বাঘ প্রথমে এসে ধরেছিল ছেলেকে, হঠাৎ ছেলের আর্তনাদ শুনে বাপ ঘুম থেকে উঠেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ মাত্র একটি থাবার আঘাতেই তার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে। তারপর দুজনেরই দুটি উরুর রাং বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই বাঘ।

বাপ-ছেলের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে গোসাবায়। হাজার লোক ভেঙে পড়েছে তাদের দেখতে। কলকাতা থেকে এসেছে রিপোর্টাররা। পুলিশ ও বনের কর্তারা খুব ব্যস্ত। সেই রোমহর্ষক কাহিনী ছাপা হলো সব কাগজে, তাই নিয়েই সর্বত্র আলোচনা। গত বছর বাঘের পেটে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল তেইশ, এ বছর সেই সংখ্যা এর মধ্যেই চব্বিশ ছাড়িয়ে গেল।

চোখের সামনে টাটকা লাশ, তাজা রোমাঞ্চকর গল্প, তারপর আর মনোরঞ্জন ধাঁড়ার নিরামিষ কাহিনী কে মনে রাখতে যায়। প্রমানের অভাবে নাজনেখালির কেস চাপা পড়ে গেল একেবারে।

দৈবক্রমে, রায়মঙ্গল নদীতে নিহত লোক দুটিই পূর্ববঙ্গীয়। তাদের লাশের সামনে নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন ও সি গৌর হালদার। মনে মনে তিনি বলে চলেছেন, জানি, শুধু আমাদেরই বাঘে খায়। আমরাই সব জায়গায় মার খাই। কই, এখন তো কোনো পরিমল মাস্টার এলো না এদের জন্য দরদ দেখাতে? জানি, জানি, সব জানি, আচ্ছা আমিও দেখে নেবো।

মাঝরাতে এক বিবাগী

এমন হয় না কোনদিন মাধবের।

দেবীপুরের খাঁড়িতে ভালো মাছ পাওয়া যাচ্ছে শুনে সে চলে এসেছিল সেদিকে। ক'দিন ধরে সংসারে বড় টান যাচ্ছে। শুধু গায়ের জোর আর মনের জোর দিয়ে সে আর সব দিক সামাল দিতে পারছে না।

কোথায় মাছ, সব লবডঙ্কা। সবাই মিলে জাল ফেলে ফেলে নদী একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সামান্য গেঁড়ি গুগলিও আর ওঠে না। ভালো করে বর্ষা না নামলে আর মাছের কোনো আশা নেই। সেই যে কথায় বলে না, পরের সোনা না দিও কানে, কান যাবে তোর হ্যাঁচকা টানে। এ হলো সেরকম। কে বললো দেবীপুরের খাঁড়িতে মাছ, অমনি সে চলে এলো হেদিয়ে। এবার বোঝো ঠ্যালা। ভাটার সময় ফিরতে ফিরতে দেড় দিনের ধাক্কা।

সারাদিন জাল ফেলে ফেলে, কিছুই না পেয়ে, ক্লান্তি ও মনের দুঃখ নিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো মাধব। নৌকো বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি। মাঝ রাতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ায় সে জেগে উঠলো ধড়মড়িয়ে।

তার দৃষ্টিবিভ্রম হলো। সে কোথায়? নদীর দু ধারেই মিশমিশে জঙ্গল, এ তো দেবীপুরের খাঁড়ি নয়। আকাশে যেন কেমন ধারা ছানা কাটা মেঘ, ফ্যাকাশে মতন ভুতুড়ে আলো, নদীর জল উঁচু-নিচু, এ কোন নদী? মাধবের মনে হলো সব কিছুই অচেনা।

ছাড়া নৌকো জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে এসেছে, তার ঠিক নেই। শহুরে ফিরিওয়ালা যেমন কখনো রাস্তা-

গলিঘুঁজি ভুল করে না, মাধব মাঝিও সেই রকম এদিককার সমস্ত নদীর নাড়ি-নক্ষত্র জানে। কিন্তু সারাদিনের উপোসী পেট ও আধ-ভাঙ্গা ঘুমে সে যেন আজ সব কিছুই ভুলে গেছে। তার মনে হলো, এই নদীতে সে আগে কখনো আসে নি, দু ধারেই সমান জঙ্গল এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এত উঁচু উঁচু গাছ? সুন্দরবনের গাছ তো এত লম্বা হয় না, তবে এই আকাশঝাড়ু গাছের জঙ্গল কোথা থেকে এলো? শোনা যাচ্ছে না তো সেই পরিচিত জলতরঙ্গ পাখির ডাক?

নদী ও জঙ্গল একেবারে নিঃসাড়, কোথাও কোনো আলোর বিন্দু নেই, আর কোনো নৌকোর চিহ্ন নেই, মাধব সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে সে চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখে ঠাহর করবার চেষ্টা করছে। নৌকোটা আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। হাল ধরার কথাও তার মনে নেই। এ যেন ভরা কোটালের বান।

ভয় পাবার পাত্র নয় মাধব মাঝি, বরং একটা চাপা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে। সে যেন নতুন একটা নদীপথ আবিষ্কার করেছে, নতুন একটা দেশ, এখানে তার আগে আর কেউ আসেনি।

ও কি, মাধব মাঝি কি পাগল হয়ে গেল? হঠাৎ খ্যাপলা জাল বাঁ কনুইতে বাগিয়ে শব সে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে। মাঝ-নদীতে এইভাবে কেউ জাল ফেলে? তার মতন অভিজ্ঞ লোক কি জানে না যে জালের কাঠি মাটি না ছুঁলে সেখানে জাল ফেলে কোনো লাভ নেই? জোয়ারের সময় নদীর মাঝখানে খুব কম করেও দশ-মানুষ জল হবে!

সে সব কথা চিন্তাই করছে না মাধব, এমন কি জাল তোলার পর সে দেখছেও না মাছ উঠলো কিনা। একবার তুলে পরের বার সে ছুঁড়ছে আরও জোরে, আর কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। যেন এই নদীর মাঝখানে কোথাও আছে অতুল সম্পদ। আর কেউ টের পায়নি, মাধব ঠিক তা তুলে নেবে।

মাঝে মাঝে জাল ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ। অনৈসর্গিক আলো

মেশানো অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষ্যাপা জেলে ছুঁতে চাইছে নদীর হৃৎপিণ্ড।

দৈত্যরাও তো ক্লান্ত হয় কখনো কখনো। মাধব মাঝিই বা কতক্ষণ পারবে। এক সময় সে নৌকোর উপর জাল ছড়িয়ে রেখে বসে পড়লো। তার হাঁটু কখনো এত দুর্বল মনে হয়নি। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু দুটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে মাথা গুঁজলো। তারপর কাঁদতে শুরু করলো একটু পরে।

সংসার যুদ্ধে পর্যুদস্ত কোনো বয়স্ক সেনাপতির কান্নার মতন এমন উপযুক্ত, নির্জন জায়গা আর হয় না।

সেইভাবেই সে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ভোর হয়ে গেল। তখন চোখ তুলে মাধব তাকালো তীরের দিকে। দিনের আলো বড় নির্মম, সব কিছু চিনিয়ে দেয়। মাধব বললো, ও হরি, এ যে দেখি রানী ধোপানীর চক। আর দুটো ট্যাঁক ঘুরলেই সেই সাত নম্বর ব্লকের নিষিদ্ধ জঙ্গল।

একটু দূরে আর একটি নৌকো। আপন মনে ঘুরছে। প্রথমে মনে হলো, সে নৌকোতে কোনো মানুষ নেই, কেউ দাঁড় ধরেনি, কেউ হাল ধরেনি। একি? মাধব মাঝি স্তম্ভিত!

তারপর ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলো, নৌকোর ঠিক মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে সেইরকম দাড়ি। জানুর ওপর দুটি হাত, চক্ষু দুটি বোজা।

এ লোকটা কে? মাধব মাঝি তো রিফিউজি নয়। সে এসেছে পার্টিশানের আগে। বাদা অঞ্চলের কোন্ মাঝিকে সে না চেনে? কিন্তু এই মানুষটিকে তো সে কখনো দেখেনি। হঠাৎ গা-টা ছম্‌ছম্ করে উঠলো তার।

কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখবার পর মাধব মাঝি হেঁকে জিজ্ঞেস করলো, ও মিঞা সাহেব, আপনি কোন্ খানে যাবেন?

বৃদ্ধ চোখ মেলে শান্ত ভাবে মাধবের দিকে তাকালেন। তারপর

বললেন, আমি কোনোখানে যাবো না রে ভাই। তুমি যেখানে যাবে যাও।

—আপনি এখানে কী করতাছেন ? এ জায়গা তো ভালো না।

—শব্দ করো না রে ভাই, শব্দ করো না। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, মন পরিষ্কার থাকে, এ সময় আল্লাতাল্লা আমার সঙ্গে কথা কন। তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

মাধব মাঝি আর কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো অন্য নৌকোটির দিকে। সেটি যেন নিজে নিজেই চলেছে। মাধব মাঝির নৌকো স্থির, তবু ঐ নৌকোটা যাচ্ছে কী করে ?

দেখতে দেখতে নৌকোটা মিলিয়ে গেল নদীর বাঁকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কপালে হাত ছোঁয়ালো।

তার নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে ? দেখা যাক তা হলে। নিয়তি ঠাকুরানীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে চায় মাধব।

জোয়ার স্তিমিত হওয়ায় নৌকোটা থেমে গেছে। মাধব এবার দাঁড় ধরলো। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা সে মুখে একদানা অন্ন দেয়নি। মাটির হাঁড়িতে কয়েকমুঠো চাল আছে কিন্তু এখন ভাত ফুটিয়ে নেবার ইচ্ছেও তার নেই। খানিকটা কাঁচা চালই মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলো। সে ঐ সাত নম্বর ব্লকেই যাবে।

ডাঙার কাছে এসে সে সাবধানে অপেক্ষা করলো একটুক্ষণ। হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে। পাখির কিচির মিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। যতদূর চোখ যায়, কোথাও কোনো ঝোপঝাড় নড়ে না। বাঁদরের পাল এদিকে আসেনি। হঠাৎ দূরে বেশ জোরালো গলায় শোনা গেল কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ কোঁ। বন-বিবিকে মানত করে লোকে দেশী মুর্গী ছেড়ে দিয়ে যায়, সেগুলোই এক সময় বন-মুর্গী হয়ে যায়।

ভাটার সময় কাদা-জলে নোঙর ফেলে মাধব নামলো নৌকো থেকে। খোলের ভেতর থেকে একটা কুড়ুল সে বার করে নিয়েছে

হাতে। শূল বাঁচিয়ে, কাদায় পা টেনে টেনে সে উঠলো পাড়ে। প্রথমেই সামনের হেঁতাল-ঝোপটার ওপর মারলো কুড়ুলের এক কোপ। কিছুই নেই সেখানে।

তারপর কুড়ুলটা পাশে নামিয়ে রেখে সে হাঁটু গেড়ে বসলো মাটিতে। হাত জোড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। সে বন-আটক করবে। এক মাইলের মধ্যে কোনো দক্ষিণ রায়ের বাহন থাকলে সে আর নড়াচড়া করতে পারবে না।

প্রথমে সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো তার গুরুর শেখানো বীজ মন্ত্র। তারপর সে চিৎকার করে বলতে লাগলো বাঘ-বাঁধনের ছড়া।

এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা—
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ—
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগবে বাঘের দাঁত কপাটি।
ছাঁচি কুমড়ো বেড়াল পোড়া
ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদি রে বাঘ নড়িস চড়িস
খ্যাকশেয়ালীর দিব্যি তোকে।
এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমার নাম মাধব ওঝা।...

মন্ত্র পড়া শেষ হলে মাধব প্রায় দু ঘণ্টা ধরে পরম নির্ভয়ে আতি-পাতি করে খুঁজে দেখতে লাগলো জঙ্গল। একটা বাঘ আসুক, মাধব একবার মুখোমুখি দেখতে চায় তাকে। সামনা সামনি বাঘকে দেখলে সে বলবে, নে শালা নে, পারিস তো আমার জ্বালা যন্তোন্না জুড়াইয়া দে একেবারে। তোরও প্যাটে ক্ষুধা, আমারও প্যাটে ক্ষুধা, হয় তুই মরবি, নয় আমি মরুম।

সাত নম্বর ব্লকের বাঘ চলে গেছে অনেক দূরে। অথবা মাধবকে দেখে ভয়ে কাছে এলো না। এ ঘোর জঙ্গলে একজন একলা মানুষকে স্বেচ্ছায় ঘুরতে দেখলে বাঘেরও ভয় পাবার কথা। সে জানোয়ারেরও তো প্রাণের ভয় আছে।

মাধবের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, মনোরঞ্জনের লাশের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া। যদিও তার অভিজ্ঞতা থেকে মনে মনে জানে, ঘটনার একুশ দিন পর লাশের চিহ্ন চোখে পড়া খুবই অস্বাভাবিক। বাঘ সবটা খায় না ঠিকই, কিন্তু জোয়ারে এই জঙ্গলের অর্ধেকটা ডুবে যায়। ভাটার সময় যা পায় নদী টেনে নিয়ে চলে যায়। বাঘ তো বেশী দূর লাশ টেনে নিয়ে যাবে না। খিদের জ্বালায় মারার পরই কাছাকাছি বসে খাবে।

অনেকখানি বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাধব বাঘ কিংবা লাশের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। তখন সে খুব মন দিয়ে একটা বড় গরান গাছ কাটতে লাগলো। একা পুরো গাছটা কেটে খণ্ড খণ্ড করে, ডালপালা ছাড়িয়ে নিতেও তার কম সময় লাগলো না। তার মন একেবারে শান্ত, বাঘ কিংবা বনরক্ষী কিংবা পুলিসের কোনো রকম আশঙ্কাই সে করছে না।

কাঠগুলো নৌকোয় তুলতে গিয়ে এক সময় সে দেখতে পেল, কাদার মধ্যে গাঁথা সাদা পাথরের মতন কী একটা জিনিস। গোটা সুন্দরবনে পাথরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কৌতুহলী হয়ে সে জিনিসটাকে খুঁড়ে তুলতে গেল।

সেটি একটি নর-করোটি। মাংস-চামড়া-চুল সমস্ত উঠে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে। এই কি মনোরঞ্জন? হতেও পারে। না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব, মনে হয় আরও বেশী দিনের পুরানো।

তবু মাধব ধরে নিল, এটাই মনোরঞ্জনের খুলি। অনেকখানি স্বস্তি পেল সে। এবার সে গাছের একটা সরু ডাল পুঁতে দিল মাটিতে। নৌকো থেকে তার গামছাটা এনে, তার আধখানা ছিঁড়ে

পতাকার মতন বেঁধে দিল সেই ডালে এবং মন্ত্র পড়ে দিল মনোরঞ্জনের নামে। সে শুনিন, অকুস্থলে সে নিহত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে যদি একটা ধ্বজা পুঁতে দিতে না পারে, তা হলে তার ধর্মের হানি হয়। তবে কি তার গুরু শিবচন্দ্র হাজরাই এই উদ্দেশ্যে নিয়তির ছদ্মবেশ ধরে তার নৌকোটা টেনে এনেছেন এই সাত নম্বর ব্লকে ?

কাঠগুলো নৌকোতে বোঝাই করে, মাথার খুলিটাও মাধব নিয়ে নিল নিজের সঙ্গে। পুলিসের দারোগাই বলো, আর গভরমেণ্টই বলো, কেউ এই খুলিটা দেখে বিশ্বাস করবে না যে, মনোবঞ্জন খাঁড়াকে বাঘে খেয়েছে। এই তার প্রমাণ। এর আগেও কত লোককে খেয়েছে। তাছাড়া নদীতে ভাসতে ভাসতে কত মড়া আসে, ভাটার সময় কাদায় আটকে যায়। এ বকম মাথার খুলি গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যেতে পারে। তবু একলা অনেক দূরের পথ ফিরতে হবে, এই খুলিটাই মাধবের সঙ্গী।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আকাশটা লালে লাল। পাখিব ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নদীর এপার থেকে ওপারে। পৃথিবীটাকে এই সময় কী সুন্দর, শান্তিময় মনে হয়।

আশ্চর্য, এখনো এই নদীতে আর একটাও নৌকো কিংবা পেট্রোলেব লঞ্চ দেখা গেল না। প্রায় দু-আড়াই দিন হয়ে গেল মাধব কারুর সঙ্গে একটিও মন খুলে কথা বলেনি।

শুকনো লকড়ি, পাতা কিছু জড়ো করে এনেছিল মাধব, তাই দিয়ে তোলা উনুনে আগুন জ্বালালো। মিষ্টি জল নেই সঙ্গে, নদীর নোনা জল এত নোনা যে তা মুখে তোলা যায় না, বমি আসে। এই জল দিয়ে ভাত রাঁধলেও কেমন যেন অখাদ্য হয়। তবু কী আর করা যাবে। দু মুঠো ভাত না খেয়ে মাধব আর পারছে না।

জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি সময়টায় নদী যেন একেবারে থেমে থাকে। এই সময় আর নৌকো চালাবার মতন তাগদ মাধবের নেই। অত্যন্ত নোন্‌তা আর হড়হড়ে খানিকটা ভাত

খেয়ে তার শরীরটা আরও অবসন্ন লাগছে। শুধু হালটা ধরে সে বসে রইলো। অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। নদীর দু ধারের দৃশ্য আবার অচেনা। শেষ-বিকেলে যে অত রঙ ছিল আকাশে, সে সব কোথায় গেল? এখন শুধু ময়লা ময়লা মেঘ। তবে আজ ডান পাশের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে একটা জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র, ট-র-র-র! ট-র-র-র।

ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে, থেমে-থাকা নৌকোয় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর মাধব কথা বলতে শুরু করলো।

—অ মনো, মনো রে! তুই শুইনতে পাস আমার কথা?

সাদা রঙের মাথার খুলিটা ঠিক মাধবের সামনে পাটাতনের ওপর বসানো। চোখ দুটোর জায়গায় দুটো কালো গর্ত। তবু যেন সে মাধবের দিকেই তাকিয়ে আছে।

—অ মনো, চাইয়া ছাখ, আমি মাধবদা। অমন সোন্দর মুখখান্ আছিল তোর, কার্তিক ঠাকুরের মতন টানা টানা চক্ষু...হায়রে, সব কোথায় গেল। মরলে সব মানুষই সমান, আমি মরলে আমার মাথাডাও এই রকমই হইয়া যাবে···আমার মাথার খুলি, তোর মাথার খুলি, মাইয়া মানুষের খুলি, সবই এক···ক্যান তুই আইলি আমাগো সাথে···ঘরে নতুন বিয়া করা বউ··

ফিন্ ফিন্ করে বাতাস বইছে। আজ আবার একটু পরেই বোধ হয় বৃষ্টি আসবে।

হ্যামলেট নামের প্রসিদ্ধ নাটকটির কথা তো কিছুই জানে না মাধব। জানলে বোধ হয় সে সেই অর্ধোন্মাদ রাজকুমারের অনুকরণ করতো না।

—সইত্য কথা ক তো, মনো, তোর প্রাণডা পেরথম ঝটকাতেই ব্যায়রাইয়া গেছিল? কষ্ট পাস নাই তো? নাকি লড়ছিলি? অইন্তত একখান্ কোপও মারছিলি সে সুমুন্দির ভাইডার মাথায়? তোরে আমরা অনেক বিছরাইয়াছিলাম, বিশ্বাস কর, মনো, খোঁজার আর

কিছু বাকি রাখি নাই, তোরে একেবারে ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া গেল ? সে সুমুন্দির ভাই রে একবার সামনে পাইলে···বিড়ি খাবি, মনো ? আমি একটা খাই ? আর তুইখান্ মাত্তর বিড়ি আছে, কত দূরের পথ—

উনুনের আঁচ এখনো নেবেনি, দেশলাই খরচ না করে সেখান থেকেই বিড়িটা ধরালো মাধব কাল রাতে বৃষ্টি ভেজায় বিড়িটা স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। এই রকম স্যাঁতসেতে বিড়ি টানার যে কী যন্তোন্না, তা শুধু ভুক্তভুগীই বুঝবে। হে ভগবান, এইটুকু সুখও কি দেবে না।

—অ মনো, কথা কস্ না কেন ? অমন দম ফাটাইন্যা গলার আওয়াজ আছিল তোর! 'বঙ্গে বর্গী' পালায় ভাস্কর পণ্ডিত তুই বড় ভালো করছিলি···জয়হিন্দ ক্লাব এবার একেবারে কানা। অশ্বিনী চইল্যা গেল, তুইও গেলি···দূর শালা—

বিরক্ত হয়ে নিবে যাওয়া বিড়িটা মাধব ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। তারপর সে একটি উন্মাদের মতন কাণ্ড করলো।

মাথার খুলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর সেই জনমানব শূন্য নদী ও জঙ্গলের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, শোনো, শুইন্যা রাখো তোমরা, তোমরা···আমি মাধব দাস মজুমদার, আমার বাপে আমারে খেদাইয়া দিছিল। মায়রে চক্ষে দেখি নাই, তবুও আমি এ-জন্মে কক্ষনো চুরি করি নাই, ডাকাতি করি নাই, কাউর কোনো ক্ষতি করি নাই। নিজের বউ ছাওয়ালপানগো দুই মুঠা ভাত দেবার জইন্যে রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলি,·· তাই তোমরা আমারে একটা বিড়ি পর্যন্ত মনের সুখে টাইনতে দেবা না ? তোমবা ভাবছো কি ? আমি মাধব দাস মজুমদার, আইজও মরি নাই। আমি মরবো না। আমি হাজার বছর বাঁইচ্যা থাকম, আমারে মারতে পারবা না। আমারে এই রকম সাদা ফ্যাকফ্যাকে খুলি বানাইতে পারবা না···আমি লইড়া যামু। আয়, কে আস্‌ফি আয়। কে কোথায় আছোস্, আয়···

জোয়ার-ভাটা, ঢেউ ও ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে মাধব মাঝি ছোট মোল্লাখালি এসে পৌঁছোলো তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। সারা শরীরে জলকাদা মাখা, পেটটা যেন ঠেকে গেছে পিঠে। শুধু জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ।

এদিকে ছোট মোল্লাখালিতে দারুণ হৈ চৈ, প্রচুর হ্যাজাক ও লণ্ঠনের আলো, তিনখানা লঞ্চ ও গোটা বিশেক নৌকো ভিড়ে আছে ঘাটে। পুলিস ও বন-বিভাগের লঞ্চ এক নজরে দেখেই চিনেছে মাধব, একবার সে ভাবলো, সরে পড়বে এখান থেকে। কিন্তু তার শরীর আর বইছে না। লোকালয় দেখার পর আর সে একলা একলা জলে ভাসতে পারবে না। যা হয় হোক।

নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসবার পর সে দেখলো, ব্যাপার অন্য রকম।

নদী সাঁতরে এপারে চলে এসেছে এক বাঘিনী। আজু শেখের বাড়িতে এসে একটা গরু মেরেছে কিন্তু পালাতে পারেনি শিকার নিয়ে। অতিরিক্ত দুঃসাহসের জন্যই হোক বা খিদের জ্বালাতেই হোক, বাঘ সেখানেই গরুটাকে খেতে শুরু করেছিল। লোকজন উঠে পড়ায় সকলের তাড়া খেয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছে।

সকাল থেকে প্রায় হাজার খানেক লোক ঘিরে রেখেছে আজু শেখের বাড়ি। নরখাদক বাঘই আবার সবচেয়ে বেশী ভয় পায় মানুষকে। সেই বাঘিনী আর কিছুতেই বেরুচ্ছে না রান্নাঘর থেকে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে বাঘ দেখতে। কারুর প্রাণে যেন ভয়ডর নেই। সবাই চায় বাঘ বাইরে বেরিয়ে আসুক, দুচোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া যাক। সুন্দরবনের মানুষ প্রায় কেউই কখনো জীবন্ত বাঘ দেখেনি। যে-দেখেছে, সে সচরাচর ফিরে আসে না সে ঘটনা বলার জন্য।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিস ও বন বিভাগের লোকও চলে এসেছে। বাঘটাকে রান্না ঘর থেকে কিছুতেই বার করতে পারছে না কেউ। দর্শকরা মাঝে মধ্যে ইট-কাঠ ছুঁড়ে মারে, পটকাও ফাটানো হয়েছে

ছুটো, তাতে বাঘ আরো ভয় পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি। কিন্তু সেটা যে রান্নাঘরেব মধ্যে, তা বোঝা যায়। চ্যাচাঁর বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখা যায় কালো ডোরাকাটার ঝিলিক।

বাঘকে মারবার হুকুম নেই। গোসাবা বাঘ প্রকল্পে খবর গেছে। সেখানে থেকে তাদের দ্রুতগামী স্পীড বোট আসছে ঘুমের ওষুধের টোটা। সেই টোটা দিযে ঘুম পাড়িয়ে বাঘকে নিয়ে যাওয়া হবে খাতিব করে।

ও সি গৌর হালদার একবার এসে ঘুরে গেছেন। বনবিভাগ এবং টাইগার প্রজেক্ট যখন ভার নিয়ে নিয়েছে, তখন আর তাঁর করবার কিছু নেই। বাঘের বদলে যদি ডাকাত পড়তো আজু শেখের বাড়িতে, তাহলে তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। বাঘে গরু মেরেছে। মানুষ তো মারেনি, সুতরাং কিছু রিপোর্টও দেবার নেই তাঁর।

ভিড়েব ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনের দিকে এসে দাড়িয়েছে মাধব মাঝি। অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, জলেভেজা শরীর, তবু উত্তেজনায় ধক ধক করছে তার বুক। এই বাঘিনীটাই কি মেরেছে মনোরঞ্জনকে? না, তা হতে পারে না, সেই সাত নম্বর ব্লক থেকে এত দূব ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসবে কী করে? তবু বাঘ তো।

সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎরা এসেছে কিনা খুঁজবার চেষ্টা করলো সে একবার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কিছু বুঝবার উপায় নেই। হঠাৎ তার মনো হলো, মনোরঞ্জন যেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। এক মাস আগে হলেও, এমন খবর পেলে মনোরঞ্জন ঠিক ছুটে আসতো দেখবার জন্য। এখনো সে আসবে না? শরীরে একটা তরঙ্গ খেলে গেল মাধবের।

ঘুমের টোটা এসে পৌঁছোবার আগেই ঘটনাব গতি গেল অন্য দিকে। ছোট মোল্লাখালির একদল লোক দাবি তুললো, তারা বাঘকে নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। বাঘ এসে তাদের গাঁয়ের মানুষ মারবে, গরু মারবে আর বাবুরা এসে সেই বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে

আদর করে নিয়ে যাবে? পুলিস ও ফরেস্ট গার্ডদের ঘিরে ফেলে তারা বললো, হয় বাঘ মারো, নয় আমাদের মারো। বনবিভাগের নিরীহ বড়বাবু জয়নন্দন ঘোষাল হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই বলতে পারলেন না, মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন উত্তেজিত জনতা জয়নন্দন ঘোষালকে বেঁধে ফেললো একটা খুঁটির সঙ্গে। বাঘ মারা না হলে তাঁকে ছাড়া হবে না। পুলিস ও 'ফরেস্ট গার্ডরা বুঝলো যে ব্যাপার বে-গতিক, বাঘের বদলে মানুষ মারার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। এদিকে লোক জন যা ক্ষেপে উঠেছে, এর পর তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

পুলিস ও ফরেস্ট গার্ডদের মোট তিনটি বন্দুক, বিশেষ একজনের ওপর যাতে দায়িত্ব না পড়ে সেই জন্য তিনজনই একসঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো আজু শেখের রান্না ঘরের দিকে। কোনো রকম লড়াই দেবার চেষ্টা করলো না বাঘটা, ভিতুর ডিম হয়ে গিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে রান্না-ঘরে।

গুড়ুম। গুড়ুম। গুড়ুম। আঃ কী মিষ্টি আওয়াজ।

দ্বিতীয় গুলিটা খেয়েই বাঘটা রান্না ঘরের চ্যাঁচার বেড়া ভেঙে লাফ দিয়ে পড়লো এসে উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃস্পন্দ।

কী সুন্দর চেহারা সেই বাঘিনীটার, কী অপূর্ব শরীরের গড়ন, যেন কোনো শিল্পীর সৃষ্টি। হাত আর পা দুটো ছড়িয়ে শুয়ে আছে লম্বা হয়ে, মুখে একটা কাতর ভাব।

লোকজন সরে গিয়েছিল অনেক দূরে। মাধবই চেঁচিয়ে উঠলো, মার, মার, মার, সুন্দুন্ধির পুতকে মার—

আবার সবাই ছুটে এলো সেদিকে। প্রথমেই লাফিয়ে পড়লো মাধব। হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই সদ্য মৃত বাঘিনীর ওপর কোপের পর কোপ মেরে যেতে লাগলো সে। তারপর অন্যদের ধাক্কাধাক্কিতে এক সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঐ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ব্যাঘ্র-শরীরে।

ইচ্ছাপূরণ

বছর ঘুরে গেছে। আবার এসেছে ফাল্গুন মাস, এসেছে আকালেব দিন। নদীব ধারে বাঁধের ওপব উবু হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় জোয়ান মদ্দ মানুষদের। হাতে কোনো কাজ নেই, ঘরে খোরাকির ধান ফুরিয়ে আসছে। আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার জন্য উসখুস করছে ছোকরাদের মন।

নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসছে অনেকে। নইলে আর মহাদেব মিস্ত্রির ব্যবসা চলছে কি করে। এই সময়টাতেই কারবাব ফেঁপে ওঠে, তার বাড়ির সামনে জমে উঠে কাঠেব পাহাড়। দিনমজুরি হিসেবে মাধব মাঝিকে কাঠ ওজন করার একটা চাকরি দিয়েছে মহাদেব, মাছ ধরা ছেড়ে সে এখন ঐ কাজ করে। প্রায়ই মাধব ভাবে, বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে এই বাদা অঞ্চল ছেড়ে সে অন্য কোথায়ও চলে যাবে। কোথায় যে যাবে, সেটাই জানে না।

ছু দশজন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া মনোরঞ্জনের কথা আর কেউ মনে রাখেনি। মৃত মানুষকে নিয়ে বেশিদিন হা-হুতাশ করা এদিককার নিয়ম নয়। যে গেছে, সে তো গেছেই, যারা আছে, তারাই নিজেদের ঠ্যালা সামলাতে অস্থির।

শূন্য হাটখোলায় বসে দুপুরের দিকে তাস পেটায় সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎ আর সুভাষরা। আবার কোনো একটা যাত্রা-পালার মহড়া শুরু করার কথা মাঝে মাঝে ভাবে। মাটি আমার মা নামে একটা আধুনিক পালা ওদের খুব মনে ধরেছে, কিন্তু তার নায়কের মুখে গান আছে। তখন মনে পড়ে মনোরঞ্জনের কথা।

বেশ ভালো গানের গলা ছিল মনোরঞ্জনের, ওর জায়গা আর কেউ নিতে পারবে না।

তাস খেলতে খেলতে সাধুচরণ মাঝে মাঝে অন্যরকম কড়া চোখে তাকায় মোটা সুভাষের দিকে। এ দৃষ্টির মানে আছে। সুভাষ চোখ নামিয়ে নেয়।

পরিমল মাস্টার কথা রেখেছিলেন, সাধুচরণকে তাঁর ইস্কুলে একটা কাজ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সাধুচরণ সে চাকরি রাখতে পারেনি। অতবড় একটা জোয়ান শরীর নিয়ে সে ইস্কুলের দফতরির ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলো না। মাঠের জল-কাদা ভেঙে হাল চষা, চড়চড়ে রোদে নৌকো নিয়ে মাছ ধরা কিংবা আট টাকা রোজে সারাদিন কারুর বাড়িতে মাটি কাটায় সে অভ্যস্ত, দেহের ঘাম না ঝরালে কাজকে সে কাজ বলেই মনে করে না। তা ছাড়া, রোজ সাত মাইল ভেঙে সে জয়মণিপুরে চাকরি করতে যাবে, তা হলে তার নিজের চারবিঘে জমি কে চাষ করবে? গোটা সংসার তুলে নিয়ে গিয়ে জয়মণিপুরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, মাইনের এ কটা টাকায় সে তাদের কী খাওয়াবে?

মাথা গরম সাধুচরণের, ইস্কুলেব এক মাস্টারের ওপর রেগে একদিন মারতে উঠেছিল। াহরে থেকে আসা মাস্টারবাবুটি তাকে তুই তুই বলে ডাকতেন। প্রথম দিন থেকেই তাকে অপছন্দ করেছিল সাধুচরণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বলে, এদিককার চাষীরাও মাঠে পরস্পরকে আপনি বলে। মাস্টারবাবুটির ঘাড় চেপে ধরেছিল একদিন, সেই অপরাধেই সাধুচরণের চাকরি গেল। আসলে, গোড়া থেকেই ও চাকরিতে তার মন ছিল না।

চাকরিটি হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাধুচরণের তেমন ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছিল। তখনই বাগদা-পোনার হুজুক উঠলো। বছরের বিশেষ একটা সময়ে এই সব নদীর দুধার দিয়ে বাগদা চিংড়ির বাচ্চারা ভেসে যায়। প্রায় স্বচ্ছ, সরু আলপিনের মতন তাদের

চেহারা, খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। হাজার হাজার বছর ধরেই তারা নিশ্চয়ই ভেসে যাচ্ছে, এতদিন কেউ লক্ষ্য করেনি। এখন বাগদা চিংড়ির দাম প্রায় সোনার মতন, সাহেবরা খায়, তাই ভেড়ির মালিকরা ঐ বাগদা-পোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে লাগিয়ে দিল গ্রামের লোকদের। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-মদ্দা কেউ আর বাকি রইলো না, সবাই নেমে পড়লো নাইলোনের জাল নিয়ে। সেই সময়টায় সাধুচরণ এবং তার বন্ধুরা দিনে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে। সেই কয়েকটা দিন বড় সুদিন গেছে।

সন্ধ্যেবেলা মাঠে গিয়েছিল বাসনা, তারপর মহাদেব মিস্তিরির পুকুর থেকে গা হাত-পা ধুয়ে ফেরবার সময় হঠাৎ চমকে উঠে বললো, কে? কে?

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই। অথচ সে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে, এখানে খানিকটা বাগান মতন পেরিয়ে তারপর ওদের বাড়ি। ভয় পায়নি বাসনা। বন-বিড়ালীর মতন শরীরের রেঁায়া ফুলিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু ক্ষণের মধ্যেও কেউ এলো না দেখে সে বললো, মরণ! কোন মুখপোড়া, একবার আয় না দেখি সামনে।

ভিজে কাপড় সপ সপ করে বাসনা ফিরে এলো বাড়িতে। শরীরের গোলগাল ভাবটি খসে গিয়ে এখন তার বেশ ফুরফুরে চেহারা।

শোয়ার ঘরের দাওয়া থেকে ডলি বললো, ঐ এলেন নবাবের বেটী! বলি, ওবেলা যে ঝিঙেগুলো কুটে রাখা হয়েছিল সেগুলো সাঁতলে না রাখলে পচে যাবে না? টাকা পয়সা কি খোলামকুচি, না গাছে ফলে?

শাড়ী নিংড়োতে নিংড়োতে বাসনাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল, সেগুলো একটু আগেই রেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ থাকলেই কেউ রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পারে।

—ঘুঁচির বাপ কখন থেকে এসে বসে আছে। তাকে দুটো খেতে দেবে কোথায়, না পুকুরে গ্যাছে তো গ্যাছেই।

—আর সবাই বুঝি ঠুঁটো জগন্নাথ? দুটো ভাত বেড়ে দিতেও পারে না?

এ রকম চলে কথার পিঠে কথা। বাসনা তার শাশুড়ির সঙ্গে সমান তালে টক্কর দিয়ে যায়। আত্মরক্ষার সহজাত নিয়মেই সে বুঝেছে যে মুখ বুজে সইলে আর হবে না, তাকে লড়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ।

বাসনার আর কোনোদিনই বাপের বাড়ি ফিরে যাবার আশা নেই। তার সইয়ের দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে। পরিমল মাস্টার অনেক চেষ্টা করেও গ্রুপ ইনসিওরেন্স কিংবা সরকারের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করে দিতে পারেননি। সবাই জেনে গেছে যে তিন নম্বর নয়, সাত নম্বর ব্লকেই কাঠ কাটতে গিয়েছিল ওরা। সাধ করে বাঘের খপ্পরে গেছে, একটা বে-আইনী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে মনোরঞ্জন, সে জন্য কে ক্ষতিপূরণ দেবে?

বাসনার মা সুপ্রভা হঠাৎ মারা গেছে মাত্র দুদিনের অসুখে। তারপর তিন মাস যেতে না যেতেই শ্রীনাথ সাধু এক মাঝবয়েসী বিধবাকে রক্ষিতা করে এনেছে বাড়িতে। বউ মারা যাবার পর একজন রক্ষিতা না রাখলে তার মতন মানী লোকের মান থাকে না। কিন্তু তার ছেলে বদ্যিনাথ এটা মোটেই পছন্দ করেনি। সেইজন্য বাপ-ব্যাটাতে এখন লাঠালাঠি চলে। নিতাইচাঁদ বাংলাদেশের চোরা চালানীদের সঙ্গে যোগসাজসে বেশ ভালোই রোজগারপাতি করছিল, হঠাৎ একদিন বিপক্ষ দলের হাতে বেধড়ক ধোলাই খেয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে কাবু হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। ফটিক বাঙালও নদীতে তলিয়ে যায় নি, বরং পদোন্নতি হয়েছে তার। এখন তার দৌড় ক্যানিং পর্যন্ত। সেখানকার এক মাছের আড়তদারের মেয়ের সঙ্গে তার গভীর আশনাই চলছে। বাসনাকে মামুদপুরে ফিরিয়ে নিয়ে

যাবার জন্য আর কার মাথা ব্যথা থাকবে?

সময়ের নিয়মে সময় চলে যায়, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না। শুধু বাসনা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত্রে খাটের উপর জেগে বসে থাকে। এখনও তার আশা, বুঝি হঠাৎ ফিরে আসবে মনোরঞ্জন।

বাসনার দিকে প্রথম নজর দিয়েছিল মহাদেব মিস্তিরির ছোটভাই ভজনলাল। সে থাকে নামখানায়। মাঝে মধ্যে এদিকে আসে। দুর্গাপূজার সময় ডামাডোলের মধ্যে সে বাসনার হাত ধরে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাসনা চেঁচিয়ে উঠতেই সে ভোঁ দৌড়। এর দুদিন পরে, দুর্গাপূজার ভাসানের সময় কে বা কারা যেন একা পেয়ে খুব ঠেঙিয়েছিল ভজনলালকে। আততায়ীদের মুখ সে দেখতে পায়নি। চিনতেও পারেনি। হাটখোলার সবাই বললো, তাহলে নির্ঘাৎ ভূতে মেরেছে। এই কথা বলে, আর সাধুচরণের দল হেসে গড়াগড়ি যায়।

দ্বিতীয়জন মোটা সুভাষ। ছুঁকছুঁক করে এ বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, নানা ছুতোয় বিষ্টুচরণের সঙ্গে হেসে কথা বলে। মোটা সুভাষের মনে হয়, তাকে বুঝি বাসনার খুব পছন্দ। কিন্তু বেশি দূর সে এগোতে সাহস পায় না, সাধুচরণ প্রায়ই তার দিকে অমন রাগী চোখে তাকায় কেন? সাধুচরণ ঠিক ধরে ফেলেছে তার মতলব। এর মধ্যে একদিন বাসনা হঠাৎ মোটা সুভাষকে বললো, আপনি কবিতাকে বিয়ে করেন না কেন? আপনাব সঙ্গে ভালো মানাবে। তা শুনে একেবারে মাটিতে বসে পড়লো মোটা সুভাষ। যাচ্চলে! এই ছিল মেয়েটার মনে?

সাধুচরণ বাসনার পরিত্রাতা, কিন্তু ইদানীং তারও মনটা ইতি-উতি করে। সেই যে নদীতে মামুদপুরের লোকেদের নৌকোটা উল্টে যাবার সময় সে বাসনার হতে ধরে টেনে এক হ্যাঁচকা টানে নিজের কোলের ওপর এনে ফেলেছিল, সেই থেকে তার বুকটা খালি খালি

লাগে। বার বার সে সেই দৃশ্যটা কল্পনায় ফিরিয়ে আনে, একলা থাকলেই সে শূন্যে হাত দিয়ে সেইরকম হ্যাঁচকা টান দেয়।

কোনো না কোনো পুরুষমানুষতো বাসনাকে খাবেই, সাধুচরণ ভাবে, সে খেলে দোষ কি? মনোরঞ্জন ছিল তার বড় আপনজন, সেই মনোরঞ্জনের অবর্তমানে তার জিনিস যদি সাধুচরণ ভোগ করে তাতে কি খুব অন্যায় হয়? কিন্তু বাসনা তাকে সমীহ করে, তার দিকে ভালো করে মুখ তুলে তাকায় না। এটা বাড়াবাড়ি না? সাধুচরণ আবার সুভাষ টুভাসদের মতন মিঠে-মিঠে কথাও বলতে পারে না।

আরও যে-ক জন বাসনার শরীরটাকে খাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো তার শ্বশুর বিষ্টুচরণ। এটাও এখানকার একটা প্রথা। যে ভাত দেবার মালিক, তার একটা ন্যায্য অধিকার আছে। একটু নিরিবিলিতে পেলেই বিষ্টুচরণ তার পুতের বৌয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। বাঁ হাতখানা প্রথমে রাখে বাসনার পিঠে। তারপর আঙুলগুলো লকলকিয়ে এগোতে শুরু করলেই বাসনা ছাঁটা মেরে সরে যায়। ষাট বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে বিষ্টুচরণের, গত বর্ষায় আছাড় খেয়ে তার একটা পা সেই যে ভাঙলো, আর সারেনি, এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, চোখে ছানি, তবু এখনও তার লালচ মরেনি। ডলি তা ভালোভাবে জানে বলেই সর্বক্ষণ বিষ্টুচরণকে চোখে চোখে রাখে।

যে-সময় কাজ থাকে না, ঘরে ধান থাকে না, পেটে সর্বক্ষণ খিদে খিদে ভাব, সেই সময়টাতেই যে কেন মানুষের যৌন খিদে বাড়ে, তা বলে যাননি ফ্রয়েড সাহেব নাকি বলে গিয়েছিলেন? সে সব কিছু না জেনেও সাধুচরণ ক্ষুধার্ত বাঘের মতন ভেতরে ভেতরে গজরায় বাসনার দিকে চেয়ে।

মোটমাট চার-পাঁচটা বাঘ ওঁত পেতে আছে বাসনার দিকে। যে-কোনো দিন ঝাঁপিয়ে পড়বে, খাবে। জঙ্গলঘেঁষা দেশে এটাই নিয়ম।

বাসনা অবশ্য এ পর্যন্ত কারুকে ধরা ছোঁয়া দেয়নি। একমাত্র

সে-ই প্রত্যেকদিন এখনো মনোরঞ্জনের কথা মনে করে অন্তত একবার। প্রায়ই মুচড়ে মুচড়ে কাঁদে। শুধু স্বার্থও নয়, আরও কিছু একটার সম্পর্ক ছিল মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার। মাত্র আট মাসের বন্ধন, তারপর এক বছর কেটে গেছে, তবু সেই বন্ধন আরও তীব্র মনে হয়।

কিন্তু এই অবস্থায় আর কতদিন চলবে তার? মাত্র একুশ বছরের ডবকা চেহারার মেয়ে বিধবা হলে তারপর বাকি জীবনটা সে নিখুঁতি সন্দেশটি হয়ে থাকবে? কেউ তাকে খাবে না? এ কথা বললে এই জলজঙ্গল বাদা এলাকার একটা গরুও বিশ্বাস করবে না। বাসনা নিজেও একথা জানে, সেও তো কম দেখেনি।

এক একদিন মাঝরাতে বাসনা নিদ্রাহীন চোখে আর খাটে শুয়ে থাকতে পারে না, বাইরে এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ঐ অন্ধকারের মধ্যে সে তার ভবিষ্যতটা খোঁজে। মা নেই, তার বাপ আর তাকে কোনোদিন কাছে ডেকে নেবে না। শ্বশুরের আর অথর্ব হতে বেশী দিন বাকি নেই। ননদের বিয়ে দিতে হবে, তাতে কিছুটা জমি চলে যাবে। আধপেটা খেয়ে, মান খুইয়ে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হবে সারা জীবন। এমন ভাবে কি চলবে? আর নয়তো ।

শুধু একজন নেই। অথচ দুনিয়াটা যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। মনোরঞ্জন থাকলে সে তার শক্ত কাঁধ দিয়ে এই সংসারটাকে তুলে ধরতে পারতো। সে নেই, সে আর আসবে না।

হাওয়া নেই, রাত চরা পাখির ডাক নেই, মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট শব্দ করছে ঘাস ফড়িং, টুপ টাপ করে খসে পড়ছে গাছের পাতা, কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকছে ব্যাঙ তাদের ধরবার জন্য সর সর শব্দে এগোচ্ছে সাপ, সামনের খালটা থেকে উঠে আসছে পাট-পচানো জলের গন্ধ, চাঁদ ডুবে গেল মেঘের তলায়। চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার, বলে কোনো এক বুড়ী হুতোম প্যাঁচা গাছের ডাল থেকে উড়াল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাটিতে, চিক চিক

চিক চিক শব্দে পালাতে পাগলো ইঁদুর-ছুঁচোরা, দূরে একটা কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কয়েকবার।

জীবন চলেছে নিজের নিয়মে। নদী বয়ে চলেছে এক মনে, আকাশে ঘুরছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, দেশ বিদেশ থেকে উড়ে আসছে হাওয়া, একটা জোনাকী উড়ে যায় গোয়াল ঘর থেকে রান্না ঘরের দিকে, ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল গত বছর এই সময়ে, তার আগের বছর, তার আগের বছর···।

মাঝরাতের অন্ধকারে বাসনাকে একলা একলা বসিয়ে রেখেই এই কাহিনীকারকে বিদায় নিতে হবে। এই মেয়েটির জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দেবার মতন কলমের জোর তার নেই। ইচ্ছে মতন শেষ পরিচ্ছেদে সোনালী সূর্য এঁকে দেবার উপায়ও তার নেই। বাস্তবতার দোহাইতে সে লেখকের হাত বাঁধা।

আগামীকালের কোনো পাঁচালী লেখক কিংবা পালাকার যদি মনোরঞ্জন খাঁড়ার জীবন উপাখ্যান রচনা করে, তবে সে হয়তো এই ভাবে শেষ করবে :

বাসনা নামেতে মেয়ে বিধবা অকালে
একা একা কান্দে বসি হাত দিয়া গালে
স্বামী নাই সুখ নাই সম্মুখে আন্ধার
কোন্ খানে যাবে কন্যা সব ছারেখার
জোয়ারের নদী যেন নারীর যৌবন
অসময়ে ভাটি কেবা দেখেছো কখন ?
মন দিয়া শুন সবে পরে কি ঘটিল
নারিকেল গাছে আসি কে তবে বসিল ?
গাছে কেহ বসে নাই, প্যাঁচা দেখি এক
প্যাঁচার উপরে কেবা দেখহ বাবেক ॥
প্যাঁচার উপরে বসি হাসিছেন যিনি
তিনিই জগন্মাতা লক্ষ্মী নারায়ণী

বাসনারে দেখি তাঁর দয়া উপজিল
মানবীর লাগি দেবী অশ্রু নিষ্কাষিল
বাহনেরে কন দেবী চল মোর বাছা
প্যাঁচা সেই ক্ষণে ছাড়ে নারিকেল গাছা
এ বন ও বন ছাড়ি যান অন্য বনে
কাহারে খুঁজেন দেবী ব্যাকুলিত মনে ?
এক বন আলো করি আছেন বনদেবী
সিংহ ব্যাঘ্র থাকে তথা তাঁর পদ সেবী
সেই বনে আসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণী
বনদেবী তাঁরে কন এসো গো ভগিনী
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কেন এলে এই বনে
কহ সব ত্বরা করি অতীব যতনে।
জগন্মাতা কন তারে, শুন মন দিয়া
এক গ্রাম আছে হোথা নাজনেখালিয়া
সেথা এক বালা কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি
নদী কান্দে বন কান্দে আমি ছার নারী
তার পতি হরি নিলে তুমি কোন্ দোষে ?
সবিস্তারে তাহা তুমি বুঝাও বিশেষে।
হাসি কন বন দেবী, সে মনোরঞ্জন
বাসনার পতি সে যে জীবনের ধন
পরীক্ষার লাগি তারে রেখেছি লুকায়ে
যথাকালে দিব তারে স্বস্থানে ফিরায়ে
বছর পুরালে মেয়ে থাকে যদি সতী
অবশ্যই পাইবে সে গুণবান পতি
খাঁটি সতী হয় যদি তার কোন্ ভয়
সময়ে জীনে স্বামী আসিবে নিশ্চয়।